আরও

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স্‌ প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৬৪

মূল্য : তিন টাকা

শিল্পী : শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

আমি যখন আমার "বিচিত্র কাহিনী" লিখি, তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে ইহা জনসাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে। তাহার পর আমার বহু আত্মীয় ও অনাত্মীয় আমায় আরও এইরূপ ঘটনা লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া "আরও বিচিত্র কাহিনী" লিখিলাম। যদি এই নূতন কাহিনীগুলি জনসাধারণকে কিছুমাত্র আনন্দ দিতে পারে, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

পত্রিকা ভবন, কলিকাতা
১লা মাঘ, ১৩৬৪

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সূচীপত্র

অলীক না অলৌকিক ?

চৈত্তির মাসের তুপুর, খাওয়া দাওয়া সারা হয়েছে। ডাক্তারে বলেছে খাওয়ার পর ঘণ্টা তুই শুয়ে থাকতে। ডাক্তারের কথা শুনতে হয় বাধ্য হয়ে, বয়েসটা যে বেড়েই চলেছে। কে যেন, সুকুমার রায় না কে, এক বুড়োর কথা লিখেছে কোন গল্পে, যে বুড়ো তার বয়েসটা বেশী বেড়ে যাচ্ছে দেখলেই বয়েসের মোড় ফিরিয়ে নিতো। অর্থাৎ যেই দেখতো তার উনপঞ্চাশের ধাক্কা লাগো লাগো, অমনি সে উল্টো চালে চ'লে বয়েস কমিয়ে, আটচল্লিস, সাতচল্লিস করে চল্লিসের নীচে নিয়ে যেতো। সে আজব বুড়োর ঠিকানা তো আমার জানা নেই, কাজেই ডাক্তারের পরামর্শই নিতে হয়।

কিন্তু আমার জগাই দাদা ঘরে যেতেই নারাজ। সে বলে, "চৈত্তির মাস, এখনো মধু-মাধবীর পরশ হাওয়ায় খেলছে, তায় আজ মেঘলা দিন, মেঘে রোদে আলোছায়ার খেলা চলছে। এমন দিনে ঘরের ভিতর যাওয়াই উচিৎ নয়। আম গাছের তলায় দিব্যি খাওয়া হোলো। যদি নেহাৎ গড়াতেই হয় তবে তোমার অমন সুন্দর পুকুরের ঘাটের তুপাশে, লম্বা চওড়া, ঢালা দাওয়া রয়েছে, সেখানেই গড়াবে চলো।"

বুড়োর প্রাণে এখনো এতো সবুজ আছে জানতুম না। যাই হোক কথাটা নেহাৎ মন্দ নয় আর আজ আকাশে মেঘের দরুণ রোদেরও তেজ নাই। সুতরাং সেখানেই যাওয়া গেল। সঙ্গে আমার নাত্নী ঠাকুরাণী দিদিরাণীও এলো।

সতরঞ্চি তাকিয়া সব সামলে পেতে নিয়ে তো বসা হোলো। আমি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বললুম, "দেখ জগাইদা, আরো পাঁচ

ছটা বড় গল্প লেখা হয়ে গেছে। ভাবছি আর একটা বই করে ফেলি।”

জগন্নাথ গম্ভীরভাবে বললেন, “ছেপে ফেলো। খুব কাটবে, প্রথমটার মতন।”

আমি বললুম, আরে ছাপতে তো দিচ্ছিই। তবে গোড়ায় একটা কিছু অন্যরকম দিতে চাই। সত্যিও হবে অথচ আশ্চর্যও হবে। সেবারের মত রূপকথা নয়। তাই ভাবছি কি লেখা যায়।”

জগাইদাদা বললে, “তা বেশ। গল্পগুলি যা লিখেছ, তারই বা বিষয়বস্তু কি?”

আমি বললাম “নানারকম বিষয়। ছেলেদের গল্প আছে, কলমের জোর আর তলোয়ারের জোরের কথা আছে। আর আছে অলৌকিক ঘটনা কিছু।”

দাদার এবার টনক নড়ল। জিগেস করলে, “অলৌকিক ঘটনা আবার কি রকম?”

দিদিরাণী হেসে বললে, “ভূতপতরীর কথা আর কি।”

“উহুঁ। ভূতপতরী হলেই অলৌকিক নয়। হানাবাড়ীতে, রাত্তিরে, অমন দশ-বিশ লাখ লোকে ভূত দেখেছে। সাদামাটা আটপৌরে ভূত যাকে রাত্তির ছাড়া দেখা যায় না, বিশেষ জায়গায় ছাড়া খোঁজ পাওয়া যায় না, সে আবার অলৌকিক কি? যে ঘটনা ঘটবে বলে জানা আছে, যে জিনিস দেখা যেতে পারে বলে জানা আছে তার মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই। যে জিনিস স্বপ্নেও ভাবা যায় না দেখব বলে বা ঘটবে বলে—তাই অলৌকিক।”

দিদিরাণী এবার জিগেস করলে, “সে আবার কেমন।”

দাদা বললে, “এই মনে কর যদি ঐ পুকুরের মাঝখান থেকে জলপরীর দল উঠে আসে এখনি এই ভর দুপুরে…”

দিদিরাণী বললে, “সে তো সব রূপকথাতেই পাওয়া যায়।”

“আচ্ছা—আ, তবে মনে কর যদি আমি আরবী মন্ত্র জানতুম

আর তাই পড়ে ডাক দিলে যদি ঐ পুকুরের জল থেকে ভুস্ করে প্রকাণ্ড এক আরব্যোপন্যাসের জিন্ উঠে পড়ত…"

দিদিরাণী বললে "আরব্যোপন্যাসের জিন্ মন্ত্র পড়লে আসে না। সে হয় প্রদীপ ঘষলে আসে নইলে বোতলের ছিপি খুললে।…"

আমি এতক্ষণ আড়ামোড়া ভেঙে, শেষ পর্যন্ত তাকিয়ার উপর হেলে পড়ে, একটু আয়েসের চেষ্টা দেখছিলুম। জগাইদার বকবকানিতে ঘুম চটে যাওয়ায় আমিও কথায় যোগ দিলুম। বললুম, "দিদিরাণীকে অত সহজে ঠকাতে পারবে না। ও সব কিছু জানে। যদি ও-সব ছেলে ভুলানো ফাঁকি ছাড়া কিছু জানো তো বলো। নইলে চুপ করো।"

"আচ্ছা বেশ। মনে করো আমি যদি বিলিতি উইজার্ডদের মত হাঁক দিয়ে যদি পুকুর থেকে নিরেট রক্তমাংসের শরীর দেওয়া গ্নোম কি পিক্সি কি স্পিরিট তুলতে পারতুম…"

দিদিরাণী এবার একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, "সে কি রকম ?"

"কি রকম ? এই মনে করো আমার লম্বা সাদা দাড়ি, পরণে এক ঢিলে ঢালা আলখাল্লা, মাথায় চোঙার মত টুপি, আর বাঁ হাতে একটা লম্বা সরু সাদা ছড়ি। ঐ রকম সাজ-পোশাক নিয়ে, মনে কর আমি এমনি সোজা হয়ে বসে, ডান হাতটা পুরো বাড়িয়ে দিয়ে পুকুরের দিকে, জোর গলায় হাঁক দিলুম…"

এই বলতে বলতে, উৎসাহের চোটে, আমার জগাই দাদা উঠে বসে, ডান হাতটা শক্ত সোজা করে পুকুরের দিকে বাড়িয়ে, এক বিকট হাঁক দিয়ে বললে…

"আব্রা-কাডাব্রা, মাইটি স্পেল্…"

ডাকের আওয়াজ মিলোতে না মিলোতে পুকুরের জলে ঝুপ করে এক শব্দ হোলো। সবাই চমকে উঠে সেদিকে তাকাতে জগাইদা বললে "ওফ্। মস্ত বড় মাছ, বারো-চোদ্দ সের হবে নিশ্চয়…"

আমি বললাম, "তুমি দেখলে নাকি? অত বড় মাছ তো এ পুকুরে আছে বলে জানি না।"

"মাছটা ঠিক দেখিনি। কিন্তু জল কেমন দুলছে দেখ না। তাতেই তো বোঝা যায়—"
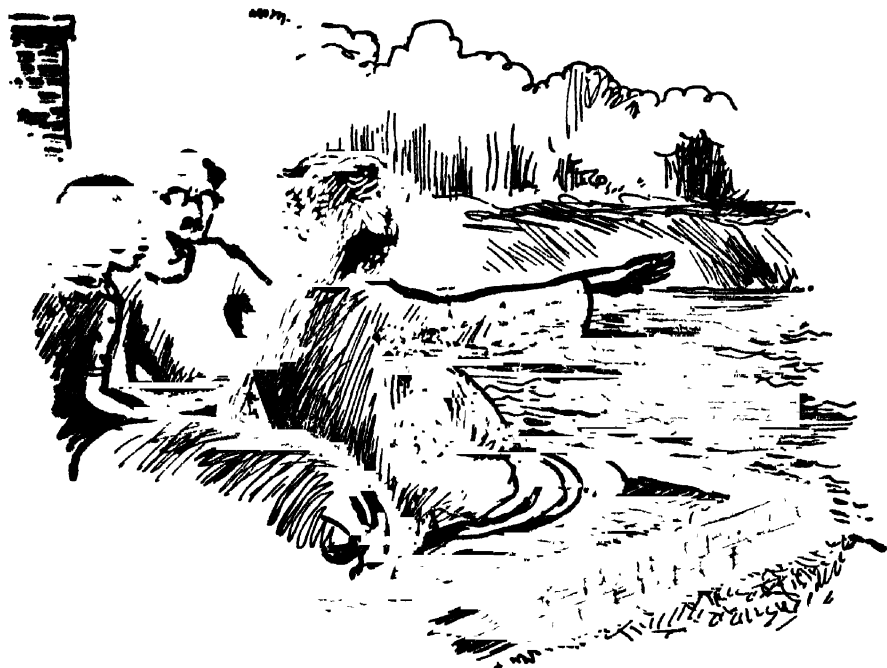
দেখলুম সত্যিই বড় ঢেউয়ের লহর পুকুরে ছড়িয়ে পড়ছে। দিদিরাণী বললে, "তারপর, হাঁক দিলে কি হবে?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, তারপর, মনে কর আমি ঐ রকম করে, সোজা হাত বাড়িয়ে, হাঁক দিলুম"—বলে এবার সে বাঁ-হাতটা পুকুরের অন্য দিকে দেখিয়ে ফের আর এক হাঁক দিলে—

"আ-ব্রা-কা-ডা-ব্রা মাইটি স্পেল্—"

সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে আরো জোরে ঝপাৎ শব্দ, আর পুকুরের জল তোলপাড়!

আমি বললুম, "তাই তো, খুব বড় মাছ। দেখা গেল না এই যা, কিন্তু আছে নিশ্চয়।"

জগাইদা গম্ভীরভাবে বললে, "যদি মাছ না হয়ে ভোঁদড় হয় ?" আমি তো আঁৎকে উঠলুম, ভোঁদড় মানে তো পুকুরের মাছের দফা রফা। বললুম, "কি যে বলো তার ঠিক নাই, ভোঁদড় হবে কেন ?"

"যদি এক জোড়া ভোঁদড় হয় ? প্রথম ডাকে ছোটোটা ভয় পেয়ে জলে ঝাঁপিয়েছে, আর পরের ডাকে বড়টাও ভড়কে জলে ডুব দিয়েছে।"

আমার তো চক্ষু স্থির! বললুম, "দেখ, ভাল করে দেখ। টুঁ শব্দটি কোরো না তাহলে ওরা ভেসে উঠে সাঁতরে পাড়ে উঠবে। তারপর যা বিহিত করা যাবে।"

সকলে পুকুরের দিকে তাকিয়ে রইলুম। খানিক পরে বাড়ীর থেকে কে দিদিরাণীকে ডাকতে এলো আর সে চলে গেলো।

তারপর আরও খানিকক্ষণ গেলো। চারিদিক নিস্তব্ধ, পুকুরের জলও ক্রমে স্থির হয়ে এলো। এমন সময় ঘাটের পাশের ছোট ঘরটার পেছন থেকে হাসির আওয়াজ এলো। বলতে ভুলে গেছি ঘাটের পাশেই মেয়েদের সুবিধের জন্যে একটা ছোট পাকা ঘর করা আছে।

হাসির শব্দে একটু চমকে উঠলুম আর বিরক্তও হলুম। হাসির শব্দটা মেয়েলি গলার কিন্তু সেটা বাঙালী মেয়ের 'কম্পিত মৃদু হাস্য' নয়, সে যেন হাসির ফোয়ারা। কে আবার এলো জ্বালাতে ভাবছি ···এমন সময় সেই ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক মেম-সাহেব! শুধু মেমসাহেব বললে কিছুই বলা হয় না, এমনিই আশ্চর্য তার চেহারা আর অপরূপ তার সাজসজ্জা। তার বর্ণনা করা আমার সাধ্যি কি।

টক্‌টকে দুধে আলতার রঙ, নিখুঁত গড়ন—অবিশ্যি সাহেবী মতে। এক কথায়, উজ্জ্বল দেহকান্তি, তবে একটু ছোটখাটোর উপর। পরণে ঘাঘরার ওপর ছোটবড় ঘাঘরা বসালে যেমন হয়, সবচেয়ে নীচে

সবচেয়ে বড়, তার ওপরেরটা একটু খাটো, তার উপরে আরেকটা আরও খাটো, এই মত আট-দশটা ঘাঘরার মত ফ্রক। সেটা সাদা দুধের ফেনার রংয়ের রেশমে অসংখ্য কুঁচি দিয়ে, কড়া ইস্ত্রী করে একটা ঝুড়ির মত কাঠামোর উপর এঁটে দিলে যেমন ফুলে থাকে সেই রকম ফুলে আছে। সাদা রেশমের উপর জরীর নক্‌শা চিকমিক করছে। উপরে কিংখাবের জ্যাকেট, তার গলার কাছে দামী রঙীন লেস। মাথার সোনালী চুল চুড়ো করে বাঁধা, তবে দুপাশের কোঁকড়া চুল এসে পড়েছে দুই গালের উপর। মাথার চুড়োয় জড়ানো এক সরু সোনার চেন তার সামনে তারার মত ঝিকমিক কর্‌ছে এক প্রকাণ্ড নীলমণি। গলাতেও মণিমাণিক্যের মালা ঝলমল করছে, কিন্তু সব থেকে উজ্জ্বল তার জ্বলজ্বলে কটা চোখ, আর ঠোঁটের বাঁকা হাসি।

বয়স কত? মেমসাহেবদের বয়েসের হিসেব আমি জানি না ভাই। এটিকে প্রথম দেখে মনে হলো আধবয়সি, কিন্তু চোখের চাউনিতে মনে হলো তার বয়সের কূলকিনারা নেই।

আমি তো অবাক হয়ে তাকে খানিক দেখে বললুম, "এ মেমসাহেব আবার এলেন কোত্থেকে এই অবেলায়?" আমার কথা শুনে মেমসাহেব হাসি মুখে এগিয়ে এলো। জগাইদা বললে, "আর এলেন তো, পুকুর ঘাটেই বা এলেন কেন?" মেমসাহেব তার দিকে ফিরে, দুহাতে তার ফ্রকের দু পাশ ধরে, বাঁ পা এগিয়ে ঝুঁকে মেমসাহেবী কায়দায় সম্ভ্রম জানিয়ে, বেশ মধুর গলায় বললেন—

"আঁসাঁতে মশ্যেয়।"

জগাই দাদার তো শুনে আক্কেল গুড়ুম! সে বললে—

"আঁচাতে? কি খেলেন মেমসাহেব যে পুকুর ঘাটে এলেন আঁচাতে?"

মেমসাহেব এবার এক ঝলক হেসে বললেন—

পার্দনে মোয়া—"

দাদা আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "কিসের মোয়া ভাই?"

আমি বললুম "থামো দাদা। মেমসাহেব বোধ হয় ফ্রেঞ্চ বলছেন।" তারপর তাঁকে সহজ গলায় বললুম,—

"মাদাম আই ওনলি স্পিক্ ইংলিশ। নো ফ্রেঞ্চ।" মেমসাহেব মহাখুসী।" "স্পিক ইংলিশ ?" বলে সে ঘুরে, মুখ তুলে ডাক দিলো—

"শে-এ-রী, রোজা—"

কাকে ডাকে, কি চায় ? আঁচাতে এসে আবার শেরী শ্যাম্পেন কেন—এই সব ভাবছি, এমন সময় সেই কাপড় ছাড়ার ঘরের পাশ থেকে খট্‌খট্ জুতোর আওয়াজ করে আর একটি মেমসাহেব এসে হাজির।

প্রথমটির বয়সের যদি বা সন্দেহ ছিল, এর বেলায় ওসব কিছুই নেই। নিটোল স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল মুখ, সবই কাঁচা বয়সের প্রমাণ। এটি অন্যটির চেয়ে অনেক লম্বা বড়সড়। মুখে গালে তার বিলিতি গোলাপের রং, মাথার চুল যেন আগুনের হল্‌কা। চুল উঁচু খোঁপা করে পেছনে বাঁধা, তার উপর ফুল দেওয়া ধুচুনীর মত হ্যাট, তবে মাথার ওপরটা আর সামনেটা খোলা। দুপাশে গালের ওপর থোপা থোপা কোঁকড়া চুল। পরণের ফ্রক জ্যাকেট একই ধরনের তবে রঙীন মোটা রেশমের, নীল ও লাল রঙ তাতে বেশী।

আগেরটি নতুনটিকে তড়্‌তড়্ করে কি সব বলতে, সে আমাদের দিকে ধীরে এগিয়ে এসে প্রথমে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালে। তারপর ইংরেজীতে বললে, "তোমরা ইংরেজী বল, শুনলাম—"

আমি পাল্টা নমস্কার জানিয়ে, তাদের বসতে বলায় নতুন মেমটি একটু হেসে তার গাউনের নীচের দিকটায় তাকিয়ে বললে যে ঐ রকম পোশাকে সহজে যেখানে সেখানে বসা যায় না। সেই সঙ্গে আমাদের ব্যস্ত হতে বারণ করে বললে, "তোমরা আরামে বসো, আমরা ঘুরে দেখতে এসেছি একটু দাঁড়ালে কোন কষ্ট হবে না।"

এই বলার পর তারা দুজনেই এগিয়ে এলো আর পুকুরের এপার ওপার দেখতে লাগল, যেন অনেকদিন আগে দেখা কিছু খুঁজছে।

আমি মেমসাহেবের কথা মত তাকিয়ায় হেলান দিয়ে, পা ছড়িয়ে আধশোয়া, আধবসা হয়ে রইলুম। ওরা যদি নাই বসে তো আমাদের কষ্ট করা কেন। জগাইদা দেখলুম অবাক হয়ে মেম দুটিকে দেখছে, যেন নিজের চোখকেও সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

খানিক পরে আমি জিগেস করলাম, "তোমরা কোথা থেকে আসছো মেমসাহেব ?"

জিগেস করতেই তারা এ ওর মুখের দিকে তাকালো। পরে লম্বাটি বললে, "অনেক, অনে-এ-ক দূর থেকে।" তারপর একটু মে, মুচকি হেসে, বললে, "পার্ক ষ্ট্রীট থেকে—"

বুঝলুম না। পার্ক ষ্ট্রীট দূর অবিশ্যি, রাস্তা খালি পেলেও আধ ঘণ্টার বেশী লাগে মোটরে আমার বারাসাতের বাড়ীতে আসতে। তবে এতই কিছু দূর নয়। যাই হোক, তারপর জিগেস করলুম—

"তা, এখানে এলে কি মনে করে ?"—বলেই সঙ্গে সঙ্গে বললুম—"অবিশ্যি আমরা খুব খুসী তোমরা এখানে এসেছ বলে। এরকম সৌভাগ্য আমাদের অল্পই ঘটে।"

মেমসাহেব বোধ হয় আমার কাছ থেকে এতটা খাঁটি বিলিতি আদবকায়দা দুরস্ত কথা শুনবে ভাবেনি। তাই সে প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আমায় দেখলে তারপর হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে বললে, "তোমাকে ধন্যবাদ, মহাশয়। এটা তোমার খুবই সৌজন্য—" বলে দুজনেই জোরে হেসে উঠলো। হাসির পর অল্পবয়সী মেম-সাহেবটি একটু গম্ভীর হয়ে, কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে বলতে লাগলো—

"অনেকদিন আগে এইখানে এসেছিলাম—অনেক বদল হয়ে গেছে—পুরানো ছোটো বাড়ীটা নাই—পুকুরটা অনেক বড় আর পরিষ্কার হয়ে গেছে, পুকুরের এ পাশের প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটা নাই—কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই সেই জায়গা যেখানে,—যেখানে—" বলতে বলতে সে থেমে একটু হেসে বললে, "বড় আবোল তাবোল বকছি—না ? আমি এখানে যখন এসেছিলাম তখন এসব জায়গা জঙ্গলে ভর্তি ছিল, রাস্তা সবই কাঁচা, গরুর গাড়ীর পথ মাত্র ছিল। তাই কি রকম আশ্চর্য ঠেকছে।"

আমারও আশ্চর্য ঠেকছিল মেমসাহেবের কথাবার্তা। বাগানের জমি অবিশ্যি খুবই ঝোপঝাড়ে ভর্তি ছিল যখন আমি কিনি। কিন্তু সে তো অনেক দিন হয়ে গেল। আর বারাসতের রাস্তা পাকা বাঁধানো সড়ক হয়েছে সে তো বহুদিন। মেমসাহেব নিশ্চয়ই ভুল করে এসেছে, নইলে ওর ঠাকুর্দার আমলে যা বদল হয়েছে ও তা দেখবেই বা কি করে আর বলবেই বা কেন ?

মেমসাহেব কিন্তু ঠিক এক ভাবেই বলে যেতে লাগলো। "এ জায়গাটাই সব মাঠ জঙ্গল আর ঝোপে ভর্তি ছিল। যতদূর মনে পড়ে এর আশ-পাশও ঐ রকমই ছিল। শুধু মাঝে মাঝে ছোট ক্ষেতের পাশে মেঠো রাস্তা, দশ-বিশটা কুড়ে ঘর আর দু-চারখানা ছোট-বড় পাকা বাড়ী, তাও পোড়োই বেশী। এইখানে একটা বাগান, একটা ছোট পুকুর, যা একটু পরিষ্কার ছিল। তাও পুকুরের ওপাশেই জঙ্গল। আর সমস্ত তল্লাটটারই বদনাম ছিল ডাকাত আর বুনো জানোয়ারের জন্যে……"

আমি আরও আশ্চর্য হয়ে বললাম, "এ কতদিন আগের কথা তুমি বলছো? চোরডাকাতের ভয় এখনো আছে। কোলকাতা শহরেই এখনো দিনে ডাকাতি হয়। কিন্তু বুনো জানোয়ার—চিতে বাঘ আর বুনো শুয়োরের কথা বলছো বোধ হয়।"

মেমসাহেব খুব জোরে মাথা নেড়ে বললে, "নো, নো-নো, টাইগার, বেঙ্গল টাইগার।" বলে সে বলে চললো "আমি নিজে এইখানে দেখেছি বাঘ। ওঃ, সে কি ভয়ানক ঘটনা!" সে যেন ভাবতেই শিউরে উঠলো, তারপর আমায় জিগেস করলে, "শুনবে সে কথা?"

আমি নীরবে সায় দিতে সে মুখ ফিরিয়ে, যেন আপন মনে বলে যেতে লাগলো—

"সে অনেক দিনের কথা, আমি তখন মাত্র কয়েক মাস ইণ্ডিয়ায় এসেছি। প্রথমে পার্টি, বল নাচ, গবর্ণরের বাড়ীখানা,…এই সবে বেশ দিন কেটে গেলো। তারপর মনে হোলো যে যার সঙ্গে বিয়ে হবার জন্যে আমার এখানে আসা সে তো মাদ্রাজ থেকে এসে পৌঁছালো না। লজ্জায় খোঁজ করতেও পারি না, কেউ কিছু বলেও না। বেশ কিছু দিন পরে একটা কানাঘুসো শুনলাম যে সে জুয়া খেলে অনেক ধার করে বসে আছে, তার কিছু শোধ না হলে তার পক্ষে এখানে এসে বিয়ে করা চলবে না।

"শেষে একদিন, যাঁদের বাড়ীতে আমি ছিলাম সেই বড়সাহেব

আর তাঁর স্ত্রী আমায় আলাদা ডেকে বললেন যে তাঁরা মনে করেন যে ঐ সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া ভাল, নইলে অনেকদিন আমায় বসে থাকতে হবে তার জন্যে। তার চেয়ে হয় বিলাত ফিরে যাওয়া ভাল বা অন্য কাউকে পছন্দ হলে তাকে বুঝে শুনে বিয়ে করা ভাল। তাঁদের মতে অবিবাহিত মেয়ের পক্ষে বেশীদিন এদেশে ঐভাবে থাকা ভাল নয়।

"বড়সাহেব এই সব বলে হেসে বললেন, 'তোমার জন্যে অনেকেরই ঝোঁক হয়েছে, ছেলে-বুড়ো, গরীব-বড়লোক, পল্টনের অফিসার, সওদাগর, লাখপতি, নানা রকমের। তুমি সব দেখো—তবে আমাদের না জানিয়ে কিছু করে বোসো না। আনন্দ করো, কিন্তু বুঝে শুনে—'

"মনটা খারাপ হয়ে গেলো। দিন কয়েক ঘরেই রইলাম, কোথাও গেলাম না। কয়দিন পরে সেই বড়সাহেবের বিবি বললেন—'এরকম ঘরে বন্দী হয়ে বসে থাকলে তোমার ঐ সুন্দর চেহারা খারাপ হয়ে যাবে। দমদমে তিনচার দিন খুব বড় খানা আর নাচ আছে, চলো কাল আমাদের সঙ্গে, আমোদ আহ্লাদ করতে—'

"দমদমে প্রকাণ্ড বাড়ী, মস্ত বাগান, লোক লস্কর, সেখানে দিন দুই খুব খাওয়া-দাওয়া নাচগানে কেটে গেলো। সব ব্যাপারেই এক মিলিটারী ক্যাপ্টেন আমার পাশে ঘোরাঘুরি করলে। সে বড়ঘরের ছেলে, পল্টনের সঙ্গে অল্পদিন হোলো এসেছে। বোধ হয় সে জানতে পেরেছিল যে আমার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাবার দাখিল, কেন না আমি যে বড়সাহেবের সঙ্গে এসেছিলাম তিনিই তাকে আমার কাছে এনে পরিচয় দিয়ে বললেন, 'এর নাম কাপ্টেন ওয়াল্টার ম্যালিসন, আর এ রোজ এল্মার।' তারপর থেকে ক্যাপ্টেন ওয়াল্টার আমার সঙ্গ আর ছাড়েই নি।

"তৃতীয় দিনের দুপুরে সকলে খাওয়ার পর জিরোতে গিয়েছে, সেই সময় আমি একটুক্ষণ ঘরে বসে, পরে উঠে বাগানের দিকে

বেড়িয়ে এলাম। মনটা এমনিই ভার ছিল, তার উপর ক্যাপ্টেন ওয়াল্টারের মনের ইচ্ছা কি তা বুঝতেই পারছিলাম। তাই সে যদি বিয়ের প্রস্তাব করে তো কি করবো তাও ভাবা দরকার। যাঁদের বাড়ীতে আমি ছিলাম তাঁরা ক্যাপ্টেনকে উপযুক্ত মনে না করলে আমার মত ছেলেমানুষ আত্মীয়ার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিতেন না। অন্য দিকে যার জন্যে এতদূর থেকে এলাম, সে আসেও না, খোঁজ-খবরও দেয় না।

"বাগানের নিরিবিলিতে এই সব ভাবছি এমন সময় সেখানে ক্যাপ্টেন ওয়াল্টার হাজির! সে মহাখুসী হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার গম্ভীর মুখ দেখে একটু থেমে জিগেস করলে, 'মিস এল্মার, শরীর কি অসুস্থ মনে হচ্ছে?'

"আমি বললাম, 'আমার শরীর মন দুইই ক্লান্ত।' তাতে সে বললে, 'চলুন ঘোড়ায় চড়ে একটু ঘুরে আসি। খোলা হাওয়ায় মনের ঝুলঝাল উড়িয়ে দেবে এবং শরীরও তাজা হবে। এঁদের এখানে ভাল ঘোড়া, মেয়েদের জন্যে জিন সাজ সবই আছে।'

"ঘোড়ায় চড়া আমার খুবই পছন্দ ছিল, তাই আমি রাজী হলাম। যখন আমি ঘোড়ায় উঠতে যাব তখন একজন চাপরাসী ক্যাপ্টেনকে কি বললে। সে প্রথমে ধমক দিয়ে তার পর কি কথা বললে। আমি হিন্দুস্থানী কি বেঙ্গলী জানতাম না, ক্যাপ্টেনও বোধ হয় ভাল জানতো না। যাই হোক সে আমায় ঘোড়ায় তুলে দিয়ে এখনি আসছি বলে বাড়ীর ভিতর ছুটে গেলো আর একটু পরেই একজোড়া লম্বা দোনলা ঘোড়সওয়ারের পিস্তল নিয়ে এলো। আমি জিগেস করায় সে বললে, লোকটা বলছিল যে এদিকে কোথায় বুনো জানোয়ার না ডাকাত সব আছে, মেমসাহেবকে নিয়ে বেশী দূরে না যেতে। আমি তাই এগুলো নিয়েছি—'

"খানিকদূর পর্যন্ত আমরা একথা সেকথা বলতে বলতে গেলাম। ঘোড়া দু'টোই খুব ভাল ছিল। একটু আগে গিয়ে সামনে খোলা

মাঠ পেলাম। ক্যাপ্টেন ওয়াল্টার আমায় বললে, 'বাঃ বেশ খোলা জায়গা, একটু দাঁড়িয়ে যাওয়া যাক—'

"আমার মনে হোল ক্যাপ্টেন হয় তো এখন বিবাহের প্রস্তাব করবে; সেইজন্যে বললাম, 'থামবো কেন? চলো তোমার সঙ্গে রেস্ দি'—এই বলেই আমি ঘোড়ার গায়ে ঠোকর দিয়ে, চাবুকের ছোঁয়া দিলাম। তেজী ঘোড়া লাফ দিয়ে এগিয়ে ছুটে চললো, সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেনের ঘোড়াও পাল্লা দিয়ে চললো।

"ঝড়ের মত ঘোড়া ছুটিয়ে, মাঠ পার হয়ে আমরা একটা কাঁচা রাস্তায় এলাম। রাস্তা খালি ছিল আর দিনের আলোও ছিল কাজেই আমরা উড়ে চললাম, আমি একটু আগে আর ক্যাপ্টেন একটু পিছে। আরো খানিক গিয়ে একটা পিপল গাছ দেখলাম—সেটা আজও রয়েছে দেখছি। সেই কাঁচা রাস্তাই আজ পাকা রাস্তা, তোমার বাড়ীর সামনে—

"গাছের নীচে অনেকগুলো লোক বল্লম লাঠি এইসব নিয়ে জটলা করছিল। আমাদের আসতে দেখে তাদের দু-তিনজন রাস্তার মাঝে এসে চীৎকার করে কি বলতে লাগলো। আমি ঘোড়ার রাশ টেনে থামাবার চেষ্টা করছি এমন সময় ক্যাপ্টেন ওয়াল্টার 'হট্ জাও, গোলি করেগা।' ব'লে হেঁকে উঠতে তারা লাফিয়ে সরে গেলো। কিন্তু মনে হোলো চেঁচিয়ে আমাদের কি বলছে। ক্যাপ্টেন বললে, 'থেমো না এগিয়ে চল—'

"আরো খানিকক্ষণ গিয়ে ঘোড়ার দৌড়ের বেগ যখন কমেছে, তখন আমাদের খেয়াল হোলো যে বেলা পড়ে আসছে, ফিরে যাবার কথা ভাবা দরকার। আমরা তখন এই জায়গায়, যেখানে এখন আমরা রয়েছি, এর কাছাকাছি এসেছি—ঘোড়া থামিয়ে আমি ক্যাপ্টেনকে বললাম, 'এখন ফিরে যাওয়া উচিত।' সেও ঘোড়া থামিয়ে সায় দিলে। তারপর সে বললে যে, যে পথে এসেছি সেদিক ফিরলে সেই বল্লম লাঠিওয়ালা দলের সঙ্গে দেখা হতে পারে। তারা

যদি লুকিয়ে আড়াল থেকে বল্লম মারে, সেই আশঙ্কা আছে—বিশেষ আমার জন্যে।

"এই বলে সে এদিক ওদিক দেখে বললে, 'ঐ একটা ছোট বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ওটা পুরানো কিন্তু পাকা, কুঁড়ে ঘর নয়। ওদের জিগেস করলে দমদম যাওয়ার অন্য পথ বাৎলে দিতে পারে।' আমরা এগিয়ে এই জায়গায় এলাম।

"বাড়ীটা দেখে আমরা বুঝলাম লোক থাকে, কিন্তু ডাকাডাকিতেও কেউ এলো না। তখন আমি বাগানের ওপাশে সবজির ক্ষেত দেখিয়ে বললাম ঐ দিকে হয়ত লোকজন কাজ করছে। সেই দিকে ঘোড়া চালিয়ে দেখলাম ক্ষেতে কেউ নেই। তবে ক্ষেতের পরে একটা কলাবাগান, আর তার পাশে একটা লম্বা পুকুরের মত বড় ডোবা। ডোবার পাড়ের এক পাশে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ আর তার পরই লতায় পাতায় ভর্তি এক সারি বেড়ার মত ঝোপ—

"বেড়ার ওপাশে কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে আমরা সেই ডাবার উঁচু পাড়ের উপর উঠছি এমন সময় ঘোড়া দু'টোই ভয় পেয়ে

লাফিয়ে নামবার চেষ্টা করলো। আমি প্রস্তুত ছিলাম না তাই পড়ে গিয়ে গড়িয়ে নীচে চলে গেলাম।

"নীচে গিয়ে কাপড় সামলিয়ে দাঁড়িয়েছি এমন সময় ঐ তেঁতুল গাছের ওপাশের ঝোপ থেকে একটা ভীষণ শব্দ এলো। আমি ফিরে দেখি প্রকাণ্ড একটা বাঘ, বিকট দাঁত বার করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে!

"বাঘ দেখে আমি চীৎকার করে উঠলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে পিস্তলের শব্দ হোলো। তার পরই বাঘটা ভয়ানক গর্জন করে—ওহ্ হো উঃ উ—"

মেমসাহেব চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠার সঙ্গে বাঘের গর্জন ও গুলির আওয়াজ পেয়ে আমি ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি আকাশ ছেয়ে মেঘের ঘনঘটা, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বুঝলুম বাঘের গর্জন নয় মেঘের গর্জন। এদিকে ফিরে দেখি দুই মেমসাহেবই কোথায় অন্তর্ধান করেছে।

ভাববার বেশী সময় পেলুম না। কেন না মেঘগর্জনের পরই বর্ষণ আরম্ভ হোলো। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা, তারপর চড়বড় করে শিল পড়তে স্থুরু হোলো। আমি সব গুটিয়ে ছুই লাফে সেই কাপড়ছাড়া ঘরের ভিতর, আর আমার জগাইদাও তথৈবচ।

ঘরের ভেতরও দেখি মেমসাহেবরা নেই। ভাবলাম ব্যাপারটা কি। জগাইদাও দেখলুম অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছে। কিন্তু পাছে বোকা বনে যাই সেই জন্যে তাকে কিছু জিগেস করতে পারলুম না, যদিও বেশ বুঝতে পারলুম যে তারও মনে খটকা লেগেছে কিছু একটা নিয়ে—

শিলপড়া থেমে যেতে বাড়ী থেকে ছাতা-টাতা নিয়ে লোকজন এলো। সেখানে মুখহাত ধুয়ে, একটু নিরিবিলিতে, লালচাঁদকে জিগেস করলাম "আমার কাছে কেউ এসেছিলো কি খানিক আগে ?" সে একটু অবাক হয়ে বললে, "কই না—আজ এক ঐ জগন্নাথ দাদা ছাড়া আর তো কেউ আসেনি। কারুর আসার কথা ছিলো ?"

কোনই হদিস পেলুম না। অথচ দিনের আলোয় অমন জ্বলজ্যান্ত ছু-ছুটো মেমসাহেব, ঐ রকম সাজ পোশাক কথাবার্তা ওরকম স্পষ্ট দেখলুম শুনলুম। আর আমি যদিই বা ঘুমিয়ে থাকি জগাইদা ঘুমোয়নি নিশ্চয়। সে দেখেছে শুনেছে সবই, তবে কবুল হবে না— বোকা বনবার ভয়ে, বুড়ো ধূর্ত কি কম ?

ব্যাপারটা কি তবে, অলীক না অলৌকিক ? আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করে শেষটা হোলো কি ? বাঘ মোলো, না মেমসাহেব মোলো, না ক্যাপ্টেন সাহেব মোলো—তোমরা কি মনে কর ?

ছেলেবেলার কথা

আমার নব প্রকাশিত পুস্তক 'বিচিত্র কাহিনী'তে আমার ছেলেবেলার কথা প'ড়ে কেউ কেউ আমাকে পত্র লিখে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন যে, আমি যেন আমার ছেলেবেলার সম্বন্ধে আরও লিখি। এ বিষয়ে দুটি জিনিস ভাববার আছে ঃ প্রথম অনেক দিনের কথা, অনেক ঘটনা ভাল মনে নেই; দ্বিতীয়তঃ ছেলেবেলার ঘটনাবলী কারুর না কারুর স্মৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এতে কোন কোন কাহিনী একটু ব্যক্তিগত গোছের মনে হতে পারে। কিন্তু তার কোন উপায় নাই। আজ আমার ছেলেবেলার যে কয়েকটি কাহিনী লিখছি তা আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বর্গীয় পীযূষকান্তি ঘোষের স্মৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ কাহিনীগুলো আমার বেশ মনে আছে। দাদা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। আমি অল্প বয়সে বাপ-মাকে হারাই। দাদা, বৌদিই আমাকে মানুষ করেন।

আমার দাদা খুব তেজীয়ান মানুষ ছিলেন এবং কারুর কাছে মাথা নীচু করতেন না। অথচ এদিকে পরম বৈষ্ণব এবং 'জীবে দয়া', অর্থাৎ লোকের উপকার করতে পারলে কখনই সে কাজে অবহেলা করতেন না।

দাদার সম্বন্ধে অনেক গল্প মনে পড়ে—আজ দু'একটা ব'লবো। তাঁর কৃপণ অপবাদ ছিল এবং এ নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতুম। হয়তো একটা খুব বড় কৈ মাছ ভাজা তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তিনি তার এক পিঠ খেয়ে আর এক পিঠ রাত্রির জন্য রেখে দিলেন! কোন জিনিস অপচয় করতেন না এবং যে কাজ শারীরিক পরিশ্রম করে করা যায় তার জন্য তিনি কখনও পয়সা

খরচ করতেন না। একবার গিরিডি থেকে আমাদের পরেশনাথ পাহাড়ে যাবার কথা। পরেশনাথ যাবার পুসপুসের ভাড়া শুনে দাদা বললেন, "আমার সঙ্গে কে কে হেঁটে যাবে, চল।" পরেশনাথ গিরিডি থেকে ১৮ মাইল, মধ্যে বরাকর নদী, তার ওপরে তখন পুল হয়নি। হেঁটে কিম্বা নৌকোয় পার হ'তে হ'ত। কাজেই তাঁর সঙ্গে হেঁটে যাবার আমাদের কারুরই আগ্রহ রইলো না। ফলে তিনি এই ১৮ মাইল একলা হেঁটে গিয়েছিলেন এবং সেখানে জৈন ধর্মশালায় ছু'রাত্রি ছিলেন। তিনি পরেশনাথের চূড়োয় হেঁটে উঠেছিলেন এবং বরাবর হেঁটেই গিরিডি ফিরে আসেন। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯১৫ সালে।

দাদার এই কৃপণ স্বভাব দেখে আমি একবার তাঁর কাছে বাহাছুরি নিতে গিয়ে খুবই অপ্রস্তুত হয়েছিলুম। সে আজ বহু দিনের কথা—আমি তখন স্কুলে পড়ি। আমি একবার হেছুয়া থেকে ট্রামে করে শ্যামবাজার আসছিলুম। কণ্ডাক্টর টিকিট চাইতে আসে না, আর আমি ব্যস্ত হচ্ছি। যখন প্রায় ডিপোতে এসে পড়েছি তখন কণ্ডাক্টর টিকিট করতে এলো। আমি তাকে ভাড়া দিলুম। সে আমাকে ছুটো পয়সা ফিরিয়ে দিলে আর বললে টিকিট করার দরকার নেই। আমার বেশ মজা লাগলো আর বাড়ী চলে এলুম। আমি ভাবলুম দাদাকে খবরটা দিতে হবে। আর তিনি যে রকম পয়সা খরচ করতে নারাজ তাতে নিশ্চয়ই তাঁর খুব আহ্লাদ হবে। দাদার সঙ্গে দেখা হলে আমি বললুম, "দাদা, আজ ছুটো পয়সা রোজগার করেছি।" দাদার শুনে মহা আহ্লাদ—বললেন, "কি ক'রে রোজগার করলে ?" আমি বললুম, "আজ আমি ট্রামে করে এলুম, অথচ টিকিট কাটতে হলো না। আমি কণ্ডাক্টরকে ভাড়া দিলুম, আর সে ছুটো পয়সা ফেরত দিলে।" আমি ভেবেছিলুম দাদার খুব আহ্লাদ হবে কিন্তু তাঁর মুখ দেখে আশ্চর্য হলুম। তিনি মিনিট খানেক গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন—তারপরে আমাকে বললেন, "তুমি ট্রাম কোম্পানীকে

ফাঁকি দিলে? তুমি ভুলে গেলে যে, তুমি শিশিরকুমার ঘোষের ছেলে!"

আর একবারের কথা মনে পড়ছে। আমার পিসতুতো ভাই স্বর্গীয় তড়িৎকান্তি বক্সী—জব্বলপুরের প্রোফেসর ছিলেন। তিনি তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে দিতে কলকাতায় এসেছেন। তিনি একে বিদেশী লোক, তাতে অত্যন্ত সরল ও ভালমানুষ। মেয়ের বিয়ের হাঙ্গামা পোয়ানো তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর; তাই ঠিক হ'ল যে বিয়ের যাবতীয় হাঙ্গামার কাজ আমার দাদা পীযূষকান্তি বহন করবেন ও আমার সোনাদাদা (তড়িৎকান্তি বক্সী) আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করবেন। এ কাজে আমি তাঁর সঙ্গে থাকবো,—কারণ একে তো তিনি আমাদের আত্মীয়স্বজনদের অনেককে চেনেন না, তার ওপর কলকাতার বাড়ীর ঠিকানা খুঁজে বার করা তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর। একদিন আমি ও সোনাদাদা কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করে ট্রামে শ্যামবাজার আসছি। আমরা ফার্ষ্ট ক্লাসে ছিলুম। হঠাৎ মনে হ'ল যেন সেকেণ্ড ক্লাসে দাদা পীযূষকান্তির গলা শুনা গেল। এখানে একটু হাসির কথা বলি—আমার দাদার গলা অত্যন্ত চড়া ছিল এবং তা অনেক দূর থেকে শোনা যেত। সেইজন্যে তাঁর গোপনে কথা বলার অনেক অসুবিধা ছিল। আমরা অনেক সময় দূর থেকে তাঁর গোপন কথাবার্তা শুনতুম। যাই হোক, দাদার গলা শুনতে পেয়ে সোনাদাদা বললেন, পীযূষ সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছে না? আমরা উঁকি মেরে দেখলুম দাদাই তো বটে! কে একজন লোকের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন আর তাঁর গলা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ক্রমে ট্রাম এসে শ্যামবাজার ডিপোয় থামলো। আমাদের দেখেই দাদা বললেন, "এই যে, তোমরা নিমন্ত্রণ সেরে এলে? আমি এদিকে বিয়ের কাজের অনেক হাঙ্গামা মিটিয়ে এলুম।" সোনাদাদা আস্তে আস্তে বললেন, "পীযূষ, তুমি আমার মেয়ের বিয়ের কাজ করে বেড়াচ্ছো, অথচ তুমি ট্রামে সেকেণ্ড ক্লাসে এলে। তুমি

ফার্ষ্ট ক্লাসে এলে না কেন ? আমি কি তোমার জন্যে আর একটা পয়সা খরচ করতে পারতুম না ?" দাদা মিনিট খানেক সোনাদাদার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "তুমি বল কি ? আমি নিজের কাজে সব সময়ে সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ি, আর তোমার কাজ বলে ফার্ষ্ট ক্লাসে ঘুরে বেড়াবো !" অবশ্য সোনাদাদা এ কথার কোন জবাব দিতে পারেন নাই।

এইবার একটা হাসির কথা বলি। সেবার আমি আই-এ পরীক্ষা দিয়েছি। আমার খুড়তুতো ভাই বিজনকান্তিও আই-এ পরীক্ষা দিয়েছে। সেদিনটি শনিবার। প্রায় সকলেরই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, বিজনকান্তিরও পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমার 'বোটানী' ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ 'বোটানী'র পরীক্ষা সোমবারে হবে। সেইজন্যে আমি একমাত্র হতভাগ্য যে, মন খুলে আনন্দ করতে পাচ্ছি না। আমি আমাদের বাড়ীর পেছনের বাগানে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দাদার গলা কানে এলো। আমার বৌদিদি ছাদে ছিলেন। দাদা নীচের উঠান থেকে বৌদিদিকে ডেকে বলছেন, "তোমার সঙ্গে তুষার সম্বন্ধে একটা গোপন কথা আছে।" আগেই বলেছি যে, তাঁর 'গোপন' কথা আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। তার ওপরে আবার তিনি নীচের উঠান থেকে ছাদে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। আমার নামটা শুনে থমকে দাঁড়ালুম, ভাবলুম কি রে বাবা! আমার সম্বন্ধে আবার গোপন কথা কি! শুনছি দাদা
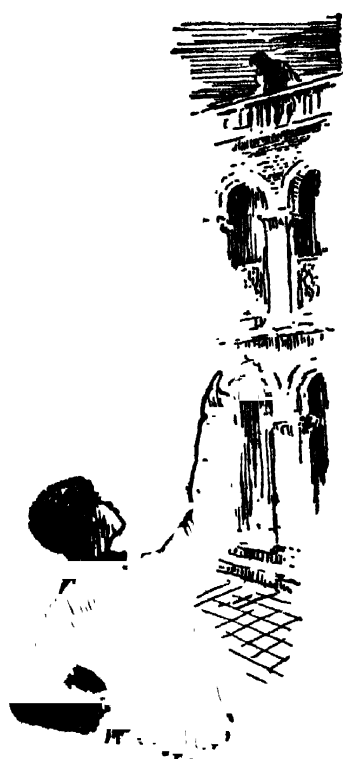
বৌদিদিকে বলছেন, "আজ কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটারে ভীষণ ব্যাপার—

খুব ভাল ছবি আছে। আমরা সবাই দেখতে যাচ্ছি। তুষারটার একজামিন শেষ হয়নি, সে যেন কোন রকমেই জানতে না পারে। জানতে পারলেই সেও বায়োস্কোপে যাবে আর একজামিনে ফেল করবে। আমরা চললুম। তোমায় যদি তুষার আমাদের কথা জিগেস করে, কিছুই বোলো না।" এই কথা বলে বাড়ীর অন্যান্য ছেলেদের নিয়ে দাদা বায়োস্কোপে চলে গেলেন। আমি বাগানে ভাবছি, এ তো বড় অত্যাচার। 'বোটানী'র একজামিন দেরীতে হবে, সেও কি আমার দোষ! তা ছাড়া বায়োস্কোপওয়ালারাই বা কিরকম লোক? তারা দিন পেলে না, তারা সেই দিনই Protea তিন পার্ট (Protea Part 1, 2 and 3) একসঙ্গে দেখাবে বলেছে। একজামিনের যাই হোক, এ ফিল্ম ছাড়া যেতে পারে না। তবে মুশকিল এই যে সেখানে গেলেই ধরা পড়বো এবং দাদা ও তাঁর দলটি নিশ্চয়ই আমাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে পাঠাবে। মনে মনে একটি মতলব এঁটে আট আনা পয়সা নিয়ে আমি রওনা হয়ে গেলুম। মতলব আর কিছুই নয়,—দাদা কখনও চার আনা সিটের বেশী যাবেন না। আমি আট আনার সিটে থাকলে আমার আর কি করবেন!

বায়োস্কোপে গিয়ে দেখি যে, চার আনা টিকিটের জানলার কাছে ভীষণ ভীড়। তখন টিকিট কাটার কোন নিয়ম বা 'কিউ' করে দাঁড়ান কিছুই ছিল না। 'জোর যার মুল্লুক তার'। বিজনকান্তি খুব ষণ্ডা ছিল, কাজেই দাদা তাকেই টিকিট কাটার ভার দিয়েছেন। যদিও বিজনকান্তির পোশাক যুদ্ধের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, অর্থাৎ তাঁর গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি কিন্তু তাতে বিজনকান্তির কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে জোর করে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে টিকিট কিনে নিয়ে এলো। তবে যে বেশে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন, বেরিয়ে এলেন কিন্তু অন্য বেশে। আদ্দির পাঞ্জাবির হাতা দুটি বগলের কাছ থেকে কে সম্পূর্ণ ছিঁড়ে নিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন সে লম্বা ঝুলওলা একটি

ফতুয়া পরে আছে। আমি ভীড়ের ভেতর থেকে এসব দেখছি আর হাসছি।

দাদা দলটি নিয়ে ভেতরে চলে গেলে আমি আট আনা সিটের একটি টিকিট কাটলুম। যদিও এখানে ভীড় অপেক্ষাকৃত কম, তবুও ভিতরে প্রবেশ করে দেখি চার আনা, আট আনা, এমন কি এক টাকার সিটও সম্পূর্ণ ভর্তি। আমি ভীড়ের মধ্যে আট আনার সীটে বসলুম ও লক্ষ্য করে দেখতে লাগলুম দাদারা চার আনার সীটে কোথায় বসে আছেন। আমার খুঁজে দেখবার দরকার হল না, কারণ এক মিনিট বাদেই দাদার গলা শোনা গেল এবং অত ভীড়ের সেই গম গম ধ্বনিও দাদার স্বরকে ডুবিয়ে দিতে পারলে না। আমি চেয়ে দেখলুম যে, দাদা তাঁর দলটি নিয়ে এক জায়গায় বসে আছেন। আট আনার সীট তাঁদের পেছন দিকে এবং আমি ভীড়ের মধ্যে বসে আছি। সেই জন্যে দাদার আমাকে দেখে ফেলার কোন সম্ভাবনা ছিল না। শুনলুম দাদা আমার ছোড়দাকে বলছেন, "ওহে নীহার, আজ তুষারটাকে খুব ফাঁকি দেওয়া গেছে। জানতে পারলে সে কি না এসে ছাড়তো? ছোঁড়ার একজামিন পরশু, এলে নির্ঘাৎ ফেল। আর একটা মজা দেখেছ—আমরা যখন এলুম কোথাও তার দেখা পেলুম না। আচ্ছা তুষারটা এখন আছে কোথায় বল তো?" আমি চীৎকার করে বললুম, "আছে এই আট আনার সীটে।" দাদা এবং তাঁর দলের লোকেরা চমকে উঠলো এবং পিছন ফিরেই আমাকে দেখতে পেলে। দাদার ভীষণ রাগ হল এবং তিনি আমাকে চীৎকার করে বললেন, "পরশু তোমার একজামিন, আর আজ বায়োস্কোপ দেখতে এসেছ। এত বড় তোমার আস্পর্ধা। মজা দেখাচ্ছি।"

আমি ভাবলুম মজা দেখাবেন কি, আমি তো নিরাপদ স্থানেই রয়েছি। আমি জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। তাতে দাদার রাগ আরও গেল বেড়ে। তিনি চীৎকার করে বললেন,

"হতভাগা, উত্তর দিচ্ছিস না যে? দেখবি মজা। আমি আসছি।" তারপর দেখি দাদা সত্যি উঠে ভীড় ঠেলেঠুলে আট আনার সীটের দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি দেখলুম মহা মুশকিল। আমি চীৎকার করে বললুম, "এখানে আসছো কি—দড়ি পেরিয়েছো কি চার আনা ফাইন।" দাদা বুঝে দেখলেন কথাটা ঠিক। চার আনা সীটের দড়ি পেরিয়ে আট আনার সীটে ঢুকলেই সত্যিই চার আনা ফাইন দিতে হবে। দাদা সেই জন্যে নিজের সীটে ফিরে গেলেন ও সেখান থেকে বকতে লাগলেন, "আচ্ছা, চল তুমি বাড়ী। আজ তোমার কি হাল করি তা দেখো।"

বায়োস্কোপ ভাঙলে অবশ্য আমি এক মিনিটও দাঁড়াইনি। তবে সে রাত্রে বাড়ীও যাইনি। আমি জানতুম যে, আমার দাদা ক্ষণক্রোধী ও আমার প্রতি তাঁর স্নেহ অপরিসীম। একটা রাত যদি তাঁর হাত এড়াতে পারি তাহলেই নিশ্চিন্ত। আমি সে রাত্রিটা মাণিকতলা ষ্ট্রীটে আমার ছোড়দিদির বাড়ীতে কাটিয়েছিলুম। অবশ্য বাড়ীতে একটা খবরও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে তাঁরা না ভাবেন। তার পরদিন যখন বাড়ী গেলুম তখন যদিও দাদা দু'চারটে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনালেন, তখন কিন্তু আর তাঁর সেরকম রাগ ছিল না। এক রাত্রে দাদার রাগ অনেকটা কমে গিয়েছিলো, তা ছাড়া আমার মাতৃস্থানীয়া বউদিদি বুঝিয়েছিলেন "ওর কাল একজামিন, আজ ওকে বকাবকি করলে ওর বায়োস্কোপ দেখার চেয়ে বেশী ক্ষতি হবে।"

সবচেয়ে সুখের বিষয় এই যে, আমি সে পরীক্ষায় ফেল ত করিইনি বরঞ্চ 'বোটানী'তে খুব বেশী নম্বর পেয়েছিলুম।

হাসির গল্প

আমরা যখন স্কুল থেকে প্রথম কলেজে ঢুকি তখনকার কালে ইংরাজী বিদ্যে, বিশেষ করে ইংরাজীতে কথা বলা আমরা খুব গর্বের বিষয় বলে মনে করতুম। বিশেষতঃ কোন সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে পারলে সেটা খুব বাহাদুরির বিষয় হত; সেই নিয়ে আমরা পরস্পরের কাছে অহঙ্কার করতুম। এই কারণে কোন সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে পারার কোন সুযোগ আমরা ছেড়ে দিতুম না, তা সে যেই হোক না কেন—গোরা সৈন্য, রেলের গার্ড কিম্বা টিকিট কলেক্টার। আমাদের কোন সাহেবের সঙ্গে কথা বলবার খুব সোজা উপায় ছিল তাকে ক'টা বেজেছে জিজ্ঞাসা করা। সে যদি বলে দিলে ক'টা বেজেছে তাহ'লে ল্যাঠা চুকে গেল, কিন্তু মুশকিল বাধত যদি সে অন্য কোন কথা বলত, যেমন, আমার ঘড়িটা সারাতে দিয়েছি কিংবা আমার ঘড়িটা ঠিক চলছে না, সে কথা আমরা কিছুই বুঝতুম না। কারণ তাদের উচ্চারণে এবং আমাদের উচ্চারণে কোন মিল ছিল না। আমরা কোন কথা ইংরাজীতে বললে সাহেবরা প্রায়ই বলতেন—beg your pardon অর্থাৎ কি বললেন আবার বলুন। আমরা ভাবতুম ব্যাটারা কি? নিজের ভাষা বোঝে না! আসল কথা এই যে, আমাদের স্কুলের মাষ্টার মশাইরা আমাদের ব্যাকরণ ও শুদ্ধ ইংরাজী শেখাতেন বটে, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই ইংরাজী ভাষার ঠিক উচ্চারণ জানতেন না। সেই জন্যে আমরা বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখতে শিখতুম, কিন্তু বলতে পারতুম না।

আমাদের ইংরাজী বিদ্যে জাহির করতে গিয়ে অনেক সময় অপ্রস্তুত হতে হত। আজকে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তখন সবে আই-এ ক্লাসে ঢুকেছি, সেই সময় একজন ইংরেজ হাসির

অভিনেতা কলকাতায় এলেন এবং আমার যতদূর মনে হয় পিকচার হাউসে (তখন সেই বাড়ীটির নাম Picture House ছিল) অভিনয় দেখাতে আরম্ভ করলেন। একদিন তিনি পত্রিকা অফিসে একখানি ফার্ষ্ট ক্লাস পাস পাঠিয়ে দিলেন। অন্য সময় পাস পেলে বাড়ীর ছেলেদের সেটি হস্তগত করবার জন্য যে রকম আগ্রহ হ'ত এই পাসটির উপর কারুর সে রকম লোভ গেল না। আসল কথা এই যে, এটা ত থিয়েটার কিম্বা বায়োস্কোপ নয় যে সবাই দেখবে,—এ হচ্ছে একজনের অভিনয়, এটা শুনতে আর বুঝতে হবে। আমি বললুম, "পাসটা আমাকে দাও, আমিই যাব। আমি তো তোমাদের মতন না, আমি ইংরেজদের কথা বেশ বুঝি।" তারা কেউ আপত্তি করলে না, আর আমি পাসটা নিয়ে পিকচার হাউস-এ গেলুম।

গিয়ে দেখি ভীষণ ভীড়। সাহেব মেমে-লোকারণ্য। যদিও দু'চারজন আমাদের দেশীয় লোককে এখানে ওখানে দেখলুম, কিন্তু ফার্ষ্ট ক্লাসটি সাহেব মেমে ভর্তি। আর আমার আসন তাদের ঠিক মধ্যিখানে। আমি গম্ভীরভাবে সেখানে বসলুম ও একটু পরেই অভিনয় আরম্ভ হল।

দেখি যে একজন সাহেব ষ্টেজে এসে হাত পা নেড়ে কি বলতে আরম্ভ করলে, সকলেই গম্ভীর ভাবে শুনছে। হঠাৎ সে কি একটা কথা বললে আর সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। একথা বলাই বাহুল্য যে আমি হাসিনি—কারণ আমি একটা কথাও বুঝতে পারিনি। আবার দেখি সে কি বলে যাচ্ছে, আর সবাই মন দিয়ে শুনছে। হঠাৎ আবার সেই দমকা হাসি। আমার ভীষণ মুশকিল হ'ল, কারণ সেখানে আমিই একমাত্র লোক যে হাসছি না। ভাবছি, করা যায় কি। কেন বাহাদুরি করতে গেলুম? আমার আরও মুশকিল হ'ল যে, আমার এক পাশে একজন মেম ছিল। আমি হাসছি না দেখে সে মধ্যে মধ্যে আমার দিকে আড় চোখে চেয়ে দেখছিল। কিন্তু বুদ্ধি থাকলে কি না হয়? একটু বাদেই মুশকিল আসান হল। আমি

যদিও অনেক চেষ্টা করেও একটা কথাও বুঝতে পারলুম না, কিন্তু তার ভঙ্গীগুলো অনেকটা বুঝে ফেললুম। যেমন কালা লোক অন্য লোকের ঠোঁট নাড়া দেখে অনেকটা বুঝে নেয়। আমি ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলুম যে সাহেবটা কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে একটা মুখভঙ্গী করে, আর সকলে হেসে ওঠে। আমি ভাবলুম যে, এইবার ঠিক হয়েছে। তোমরা ভাবছ আমি ইংরাজী বুঝি না, কিম্বা আমার হাসির ব্যাপার বোঝবার ক্ষমতা (sense of humour) নেই। এইবার দেখ। তারপরে আমি সাহেবটাকে খুব তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করতে লাগলুম। দেখলুম সে ঠিক আগের মত বকে যাচ্ছে।

তারপর সে হঠাৎ থেমে সেইরূপ মুখভঙ্গী করলে আর আমিও জোরে হেসে উঠলুম। কিন্তু একি হ'ল ? আমার সঙ্গে আর কেউ ত হাসলে

না। বরঞ্চ সকলে আমার দিকে ফিরে ফিরে দেখতে লাগল। বুঝলুম বোকা বনে গেছি—ভুল জায়গায় হেসেছি। মুখ কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। কোন রকমে ইণ্টারভ্যাল অবধি কাটিয়ে বাড়ী পিট্টান।

কালারা অন্য লোকের ঠোঁট নাড়া ও মুখভঙ্গী দেখে অনেক সময় বুঝে নেয় বটে, কিন্তু তাদেরও কোন কোন সময় অপ্রস্তুত হতে হয়। আমার এক ভালমানুষ বড়দিদি ছিলেন। তিনি কানে কম শুনতেন, কিন্তু মানতে চাইতেন না। মেজদিদির টাইফয়েড হয়েছে, আমি ঘোড়ার গাড়ীতে বোনেদের নিয়ে মেজদির শ্বশুরবাড়ী, হাটখোলা দত্তবাড়ীতে যাচ্ছি। বোন বলতে শুধু সহোদরা নয়—খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো সব বোন, কারণ আমাদের বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবার। যাই হোক, আমরা যাচ্ছি আর আমি দেখি যে সকলেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে বসে আছেন। আমি ভাবলুম জ্বর হয়েছে সেরে যাবে। এখন থেকে এত ভাববার কি আছে। সেইজন্য আমি হাসির কথা বলতে আরম্ভ করলুম। ক্রমে সকলেই হাসতে লাগলেন। এর কিছুদিন আগে বায়োস্কোপের পাস নিয়ে এক বিভ্রাট হয়েছিল। আমি সেই গল্পটা বলাতে সকলে হেসে উঠলেন। বড়দি দেখলুম যে খুব জোরে হাসলেন। আমি তখনই বুঝলুম যে তিনি কিছুই শুনতে পাননি। আমি বললুম, "বড়দি তুমি হাসলে কেন বলতে হবে।" তিনি "যাঃ যাঃ" ক'রে কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। তিনি তখন বললেন, "তোরা সবাই হাসলি, আমি না হাসলে তোরা মনে করবি আমি কালা, কিছুই শুনতে পাইনি। তাই হাসলুম। তাছাড়া তোরা সবাই হাসলি, আমার না হাসাটা কি ভাল দেখায়?"

অনেকদিন আগে পত্রিকা অফিসে এক ম্যানেজার ছিলেন। তিনি বুড়ো লোক আর তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। এই দিয়েই তিনি অফিস 'ম্যানেজ' করতেন, আর তখন অফিসও খুব ছোট ছিল। তিনি ইংরাজী খুব কম জানতেন, কিন্তু এমন ভাব দেখাতেন

বেন ইংরাজী খুব ভালই জানেন। অফিসে কোন সাহেব এলে তিনিই কথাবার্তা চালাতেন। আমরা তাঁকে খুব সমীহ করতুম এবং কোন সাহেব এলে তখনই তাঁর কাছে নিয়ে যেতুম। এখানে আমার বলা উচিত যে, পত্রিকা অফিস আর আমাদের বাড়ী একই স্থানে ছিল। সেই জন্য অফিসে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা আমরা বাড়ীর ছেলেরা সবই দেখতে পেতুম।

সেইবার (বোধ হয় ১৯১৭ সাল) আমাদের অফিসে প্রথম টেলিফোন নেওয়া হয়েছে—একটিমাত্র টেলিফোন। সেটি এক ঘরে থাকে। যাঁর যখন দরকার হয়, তিনি সেখানে এসে ফোন করেন। টেলিফোনের ঘণ্টা বাজলেই আমরা দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরতুম। আমাদের টেলিফোনে কথা বলতে খুব মজা লাগত।

একদিন বেল বাজতে আমি ছুটে গিয়ে ফোন ধরেছি। শুনলুম ওদিক থেকে সাহেবী গলায় কে বলছে, "হ্যালো পত্রিকা?" আমি "wait" বলে ছুটে গিয়ে ম্যানেজার মশায়কে ডেকে নিয়ে এলুম। তিনি ফোন কানে দিয়ে কথাবার্তা সুরু করলেন,—আমি একতরফা শুনছি।

ম্যানেজার মশায় বলছেন, "হ্যালো, হু ইউ? (তারপর নিজের বুকে অঙ্গুলির টোকা মেরে বলছেন) আই? আই হু? ইউ নট নো? আই দি ম্যানেজার, অমৃতবাজার পত্রিকা, হুইচ সার্কুলেশন গ্রেটেষ্ট ইন (তারপর আঙ্গুল গুণে গুণে) ইণ্ডিয়া, বার্মা, সীলোন।" তারপর একটু থেমে বললেন, "ইয়েস।" তারপর থেমে থেমে বার কতক "ইয়েস, ইয়েস" বললেন। তারপর টেলিফোন নাবিয়ে রাখলেন। আমি বললুম, "সাহেব কি বললে?" তিনি আস্তে মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন,—"কিচ্ছু বুঝতে পারলুম না। কিন্তু ওটাকে জানতে দিইনি। সেই জন্য ও যা বলে আমি তাইতে ইয়েস বলি।" আমি বললুম, "আপনি সার্কুলেশন সম্বন্ধে কি বলছিলেন?" তিনি বললেন, "ও আমায় পরিচয় জিজ্ঞাসা করছিল। তাই

আমাদের কাগজের সার্কুলেশনের কথাটাও বলে দিলুম। তা নইলে কি ওরা বিজ্ঞাপন দেয় ?"

আমার এক দাদা কিছুদিন বিজ্ঞাপন ডিপার্টমেণ্টের কর্তা ছিলেন। যদিও খুব বেশী ইংরাজী লেখাপড়া শেখেননি, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান ছিলেন, আর তাইতে অফিসের কাজ বেশ চালিয়ে নিতেন। তাঁর মত সদানন্দ আর আমুদে লোক দেখা যায় না। যখন আমি B. A. পাস করলুম তখন তিনি আমায় বললেন, "তুই আমার বিজ্ঞাপন ডিপার্টমেণ্টের করেসপণ্ডেন্স ক্লার্ক হ'।" আমার কাজ কি হবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন,—"কাজ এমন কিছুই নয়। যে সব বিজ্ঞাপনের চিঠি আসবে, আমি তার জবাব আমার ইংরাজীতে ব'লে (dictate করে) দেবো, তুই সেইগুলো তোর ভাষায় ভাল ইংরাজীতে লিখে পাঠিয়ে দিবি এবং একখানা খাতায় কপি রাখবি। তোকে খামের ঠিকানা লিখে ও টিকিট মেরে চিঠিগুলো ডাকঘরে ফেলে দিতেও হবে। এই তোর কাজ।" মাইনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "আপাততঃ ১৫৲।২০৲ টাকার বেশী পাবে না। পরে বেশী পাবে, আর এই সবে পাস করে বেরিয়েছ, এখন ত তোমার কাজ শেখবারই সময়।" আমার এখানে বলা উচিত যে আমাদের অফিসের তখনকার নিয়মানুসারে আমার সেই দাদার মাইনেও খুব কম ছিল। আর তখন একটি ছাড়া টাইপ-রাইটার আমাদের অফিসে ছিল না। তাতে আমার কাকা মতিবাবুর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ টাইপ করা হ'ত। কারণ, আমার কাকার লেখা কারুর পড়ার ক্ষমতা ছিল না। ভাবলুম মাইনে যাই দিক, কাজে লেগে ত যাই, পরে দেখা যাবে। তা ছাড়া আমার সেই দাদার সঙ্গ খুব লোভনীয় ছিল। তিনি খুব মজার মজার গল্প ব'লতেন আর আমাকে খুব ভালও বাসতেন। তাই তাঁর কাছে কাজ করাতে আমার কোন কষ্ট ত হ'তই না, বরং বেশ আনন্দেই সময় কেটে যেত।

একদিন তিনি বললেন, "ছাখ, আজ হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছিলুম।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি?" তিনি বললেন, "ব্যাপার আর কিছুই নয়। আজ সকালে শুনলুম যে train-এর pronoun হচ্ছে she, it নয়। তাই ভাবলুম যে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে কোন গার্ড কিম্বা টিকিট কলেক্টরের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।" আমি বললুম, "শেষকালে হল কি?" তিনি বললেন, "তেমন সুবিধে হ'ল না। একটা ফিরিঙ্গি গার্ডকে বললুম, 'When will passenger she start? ব্যাটা কিছুই বোঝে না।' সামনেই প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি দাঁড়িয়েছিল। সেটাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বার ২।৩ she বললুম, তবু ব্যাটা বোঝে না! আবার উল্টে বলে ননসেন্স। তাই বাড়ী চলে এলুম।"

কেউ বিজ্ঞাপনের কম দাম দিতে চাইলে তিনি খুব রেগে যেতেন আর ঠাট্টা করে জবাব দিতেন। একদিন একজন লোক বিজ্ঞাপনের রেট কিছু কমাতে লিখেছিল। আমার দাদা আমায় বললেন, "তুই লিখে দে, "Is it your maternal uncle's house's আবদার?" অর্থাৎ এটা কি তোমার মামার বাড়ীর আবদার? আর একজন আমাদের বিজ্ঞাপনের দাম বেশী বলাতে আমাকে dictate করলেন, "This is not fish market." অর্থাৎ এটা মাছের বাজার নয়। এখানে দর কষাকষি চলবে না। অবশ্য আমি ঠিক—এই কথাগুলোই চিঠিতে লিখে দিইনি। অন্য ভাবে তাঁর বক্তব্যটা লিখেছিলুম।

একদিন এক ফিরিঙ্গী সাহেব আমাদের এই রকম জবাব পেয়ে সশরীরে অফিসে এসে উপস্থিত। আমার দাদার সঙ্গে মহা তর্ক। সে বলে, "রেট কমাও,"—দাদা বলেন, "মোটেই না"। শেষকালে আমার দাদা বললেন, "My plain word, throw money—rub oil." অর্থাৎ আমার সোজা কথা, ফেল কড়ি মাখ তেল। শেষকালে সাহেব বললে, "তবে আমার বিজ্ঞাপন ফেরত দাও।"

ওদিকে বিজ্ঞাপনটি গেছে হারিয়ে। কাজেই আমার দাদা বললেন, "Your advertisement? That is pachared." সাহেব কিছু বুঝতে না পেরে বললে, "Pachared!" দাদা বললেন, "ইয়েস, একদম pachared, my clerk did." সাহেবটি উঠে যাচ্ছে দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলুম। একটু দূরে গিয়ে সাহেব আমায় বাংলায় জিজ্ঞাসা করলে, "মশায়, পাচার্ড মানে কি? Is it a new English word?" আমি বললুম, "Pachared মানে পাচার হয়ে গেছে। অর্থাৎ কিনা হারিয়ে গেছে। উনি বললেন না—my clerk did? মানে হচ্ছে যে ওঁর কেরানী, অর্থাৎ আমি সেটা হারিয়ে ফেলেছি।" সাহেব অবাক হয়ে চলে গেল। হয়ত আমার এই দাদাটি এর চেয়ে ভাল ইংরাজী ব'লতে পারতেন। তবে আসলে তিনি খুব আমুদে লোক ছিলেন। সেই জন্য ইংরাজীতে যেখানে আটকাত, সেখানে এই রকম হাসি ঠাট্টা করে সেরে নিতেন।

এইবার পাস বিভ্রাটের কথা বলি। তখন কলকাতায় ম্যাডান কোম্পানীর (J. F. Madan & Co.) বায়োস্কোপের ব্যবসা প্রায় একচেটে ছিল। তাঁরা একবার তাঁদের কর্ণওয়ালিস থিয়েটারের (যাহা এখন শ্রী) জন্য আমার কাকা মতিবাবুর নামে একটি পাকা পাস দেন, যাতে লেখা ছিল For Motilal Ghosh's family (মতিলাল ঘোষের পরিবারবর্গের জন্য)। আমরা এই পাস নিয়ে প্রায়ই কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখতে যেতুম। তখন সেখানে এক পার্শী ম্যানেজার ছিল। বুকিং অফিসের লোকটি আমাদের বেশ চিনতেন এবং আমরা বায়োস্কোপে গেলেই তিনি আমাদের বসবার বন্দোবস্ত করে দিতেন। আমরা সাধারণতঃ ২।৩ জনে যেতুম। কখনো কখনো ৪।৫ জনেও গেছি, কিন্তু তাতে কোন আপত্তি হত না।

আমার পুস্তক 'বিচিত্র কাহিনী'তে আমার যে সম্পর্কে দাদাটির কথা লিখেছিলাম, তিনি একদিন আমায় এসে বললেন, "হ্যাঁরে,

তোদের নাকি এক ফ্যামিলী পাস আছে, চ'দিকিনি একবার, বায়োস্কোপ দেখে আসি।" আমি রাজী হয়ে বললুম, "চলুন।" আমার এই দাদার কথা আমি আগেই লিখেছি। তাঁর বিদ্যে ছিল অসাধারণ এবং চরিত্র ছিল দেবতার মত, কিন্তু এমন আপন-ভোলা সাংসারিক জ্ঞানহীন ব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়।

আমি এই দাদার সঙ্গে বায়োস্কোপে চললুম। পথে যেতে যেতে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে, ফ্যামিলী বলতে ক'জনকে বোঝায় রে?" আমি বললুম, "তাত জানি না, তবে আমরা ৪।৫ জনও গেছি, তাতে তারা কোন আপত্তি করেনি।" দাদা বললেন, "তুই ওদের জিগেস করে দেখ্ না, ওরা কত জনকে অবধি নেবে।" আমি বললুম, "আচ্ছা।"

বায়োস্কোপে গিয়ে আমার সেই চেনা বুকিং ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি হেসে বললেন, "আজ ক'জন?" আমি বললুম, "আপাততঃ দু'জন, কিন্তু একটা কথা জিগেস করি। আপনারা সবসুদ্ধ ক'জনকে এই পাসে যেতে দেবেন?" তিনি বললেন, "এটা ফ্যামিলী পাস। ক'জন আবার কি? পাঁচ, সাত, দশ জন এলেও আমরা কিছু বলবো না।" আমি আমার দাদাকে সে কথা বললুম, আর তিনি বললেন, "তবে আয় এই বুকিং আপিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, কোন চেনা লোক এলে বায়োস্কোপ দেখাতে হবে।" আমরা দু'জনে বুকিং আপিসের পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

দাঁড়িয়েই আছি—কিন্তু কোন চেনা লোক আসে না। সময় ব'য়ে যাচ্ছে আর আমার দাদা অধৈর্য হচ্ছেন। শেষকালে তিনি বললেন, "যখন চেনা লোক এলো না, তখন অচেনা লোককেই বায়োস্কোপ দেখাব।" ঠিক সেই সময় এক জন মোটা মতন ভদ্রলোক টিকিট কাটতে এলেন। আমার দাদা তাকে বললেন, "কি মশাই, বায়োস্কোপ দেখতে এয়েছেন? আপনাকে টিকিট কাটতে হবে না (আমাকে

দেখিয়ে) এর পাশে এসে দাঁড়ান।" তিনি আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর এল হলদে পাগড়ী মাথায় একজন মাড়োয়ারী, তারপর একজন হিন্দুস্থানী—তাদেরও তিনি টিকিট কাটতে না দিয়ে আমার পাশে দাঁড় করালেন। বুকিং ক্লার্কটি অবাক হয়ে দেখছেন—তারপর এল লুঙ্গিপরা দুজন মুসলমান। আমার দাদা তাদের বললেন, "কি মিয়া সাহেব, বায়োস্কোপ দেখেগা? ইধার খাড়া হো যাও।" এতক্ষণে বুকিং ক্লার্কের ধৈর্যচ্যুতি হল—তিনি যখন দেখলেন যে আর

একখানিও টিকিট বিক্রী হচ্ছে না, তখন তিনি গিয়ে ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে নিয়ে এলেন আর আমাদের দেখিয়ে বললেন যে এঁরা সব ফ্রি যেতে চান। ম্যানেজার বললেন, "কেন এঁদের কি পাস আছে?" আমার দাদা বললেন, "হ্যাঁ, এই দেখুন" বলে

পাসটা তাঁকে দিলেন। ম্যানেজার পাসটা দেখে বললেন, "এ তো ফ্যামিলী পাস। এঁরা কে?"

দাদা—"এঁরা মতিলাল ঘোষের ফ্যামিলী।"

ম্যানেজার একবার ভাল করে আমাদের দেখলেন। তারপর আমাদের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "আপনারা বাড়ী যান, আমি এ পাস রেখে দিলুম।" এই বলে পাসটি নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

আর আমরা? আমাদের কথা না বলাই ভাল। শুধু যে বায়োস্কোপ দেখতে পেলুম না তাই নয়, তার উপর পাসটি খুইয়েছি—বাড়ীর লোকে কি বলবে। যাই হোক, আমরা বাড়ী ফিরে গেলুম। এর বেশ কিছুদিন পরে তাঁরা সে পাস ফেরত দিয়েছিলেন বটে, তবে আমরা এমন কর্ম আর করিনি।

সস্তার মজা

আর পাঁচ রকম আনন্দের মধ্যে সস্তায় জিনিস কেনার আনন্দ একটু বিশিষ্ট রকম। কারণ এর মধ্যে বাহাতুরির একটা অংশ থাকে। আর কেইবা নিজের বাহাতুরি চায় না? আমি দেখেছি যে কেউ কোন দ্রব্য স্থলভে কিনতে পারলে অতিশয় আনন্দিত হন,—এমন কি সেই জিনিসটি উপহার পেলেও হয়ত অতটা আনন্দিত হতেন না।

আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতার বাইরে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল। সাঁওতাল পরগণায়, পুরী কি ছোটনাগপুর অঞ্চলে চেঞ্জে গেলে জিনিসপত্র খুব সস্তায় কেনা যেত। তুধ, ডিম, তরিতরকারি ইত্যাদি ত সস্তা ছিলই, মাছও প্রায় জলের দামে পাওয়া যেত। আর এই মাছ কেনাতেই বাঙালীদের সবচেয়ে বেশী আনন্দ ছিল। যদিও খুব সস্তায় কিনতেন, তবুও প্রায়ই তাঁরা ঠকতেন, কারণ জিনিসের আসল দাম তাঁরা জানতেন না। সব জিনিসই তাঁদের কাছে কলকাতার দামে বিচার করে খুব সস্তা বলে মনে হত আর তাঁরা "ড্যাম চিপ, ড্যাম চিপ" (damn cheap) বলতেন। তাঁরা অজ্ঞাতসারে বেশী দাম দিয়ে জিনিস কিনতেন ব'লে তাঁদের বাজারে একটু বিশেষ রকম সম্মান ছিল। এবং তাঁদের জিনিস বিক্রী করবার জন্যে বাজারের লোকেরা স্বভাবতঃ আগ্রহান্বিত ছিল। তারা কলকাতার বাবুদের ডাম্চি (damn cheap) বাবু বলতো এবং তাঁদের মাল কেনার আগে আর কাউকে কিছু বিক্রী করতে চাইতো না। তারা স্থানীয় বাঙালী এবং আমাদের মত কলকাতার বাঙালীদের পার্থক্য খুব ভাল রকমই জানতো। একথা বলা বাহুল্য যে স্থানীয় বাঙালীদের কাছে ঠকিয়ে মাল বিক্রী করার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ—তাঁরা আসল দাম জানতেন।

এই সম্বন্ধে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। সে হচ্ছে ১৯২৪ সালের কথা। আমরা সে বারে সপরিবারে পুরী গেছি। আমার পিসতুতো ভাইপো শচীবিলাস আমাদের সংসারের কর্তা। শচীবিলাস আমার চেয়ে বছর তিনেকের যে শুধু বড় তাই নয়, তার সাংসারিক জ্ঞান আমার চেয়ে অনেক বেশী ছিল—এবং এখনো আছে। সে পুরীতে গিয়েই আমাকে বললে,—"দেখ, বাজার করবার সময় কোন মোড়লি করতে যেও না। জিনিসপত্রের কিচ্ছু দর

তুমি জান না। আমার দরদস্তুর করার সময় যেন ফট্ কোরে কিছু বলে বোস না, ওরা তখনি পেয়ে বসবে আর বেশী দামে আমাদের জিনিস গছিয়ে দেবে।" আমি আগেই বলেছি যে আমার সাংসারিক জ্ঞান অল্প, সেই জন্যে শচীর আদেশ আমি বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য করলুম। এইখানে বলে রাখা ভাল যে, চেঞ্জে গেলে আমাদের নিজে বাজার করতে যাওয়াটা একটা বিশেষ আনন্দের বিষয় ছিল। আমাদের পুরী পৌঁছবার পরদিন সকালে শচীর সঙ্গে বাজারে গেছি এবং লক্ষ্য করছি যে, শচী কি ভাবে জিনিস কেনে। আমার নিজের বেলায় দেখেছি যে জিনিস কেনবার সময় কেউ যদি আমায় বলে যে

"এক টাকা দাম", তাহলে দর করবার সময় আমি বলি—"বার আনায় দেবে?" তার চেয়ে কমিয়ে বলতে আমার লজ্জা করে। শচীকে কিন্তু দেখলুম যে সে লজ্জা সরমের কোনও ধার ধারে না। যদি কোনও জিনিসের দাম দোকানী বলে এক টাকা শচী অম্লানবদনে বল্‌তো আট আনা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখলুম সে আট আনাতেই জিনিসটা কিনে নিলে।

এই রকমে তরকারি কেনার পর আমরা মাছের বাজারে গেলুম। আমি শচীকে বললুম, "শচী, এতক্ষণ তো খুব সস্তায় জিনিসপত্র কিনলে। এখন খুব ভাল টাটকা মাছ যদি সস্তায় কিনতে পার তো বাহাদুরি বুঝবো।" সস্তায় জিনিস কিনে শচীর মেজাজ তখন খুব শরিফ। একটু মুরুব্বিআনা সুরে বললে, "এখুনি মাছ কেনা দেখতে পাবে। কেবল দয়া করে দর করবার সময় আমাকে help করতে যেও না।" আমি বললুম—"তথাস্তু।"

মাছের বাজারে গিয়ে দেখি যে, খুব ভাল ভাল পোনা মাছ এসেছে। একটি টক্‌টকে লাল রুইমাছ আমাদের পছন্দ হোলো। কলকাতায় ওরকম মাছের দাম পাঁচ টাকার কম নয়। মাছওলা বললে যে, মাছটির দাম তিন টাকা পড়বে। আমি তাড়াতাড়ি শচীকে মাছটি কিনতে বলতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু সে চোখ রাঙিয়ে আমায় চুপ করে থাকতে বললে। শচী খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করে বললে, "পাঁচ শিকেয় দেবে?" আমি ভাবলুম যে মাছওলা এবার নিশ্চয় গালাগাল দেবে—এবং দিলেও। সে বললে, "এত সস্তায় ভাল মাছ খাওয়া যায় না, কুচো চিংড়ি খেতে হয়," এবং এমন ভাব করলে যে সে আর ঐ মাছটি আমাদের কাছে বেচবেই না। শচীও এ এ বিষয়ে কম যায় না, সেও এমন ভাব দেখালে যে ঐ মাছটাকে যদি পাঁচ সিকের এক পয়সা বেশীতেও দিতে চায় তাও শচী নেবে না। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর দেখলুম যে, আবার দরাদরি আরম্ভ হোলো এবং শেষ পর্যন্ত মাছটি দেড় টাকায় কেনা হ'ল।

তখনকার শচীর মুখের অবস্থা যদি আপনারা দেখতেন তাহলে বুঝতেন যে, শচীর মেজাজ তখন কি রকম।—"আমার মত বুদ্ধিমান আর এত সস্তায় বাজার করতে পারে, এমন আর কে আছে"—এই ভাবই ফুটে বেরুচ্ছে।

তারপর ঐ মাছ নিয়ে আমরা বাসার দিকে রওনা হলুম। আর সমস্ত রাস্তা শচীর লেকচার—"তোমাদের মত লোকেরাই বাজার খারাপ করে আর এই জন্যে সংসার খরচ এত বেশী পড়ে। এই যে আমি মাছটা দেড় টাকায় কিনলুম, এই হোলো এর আসল দাম, তুমি হলে আড়াই টাকায় কিনতে।"

এই ভাবে সমস্ত রাস্তা শচীর উপদেশ ও বকুনি শুনতে শুনতে বাসার দিকে আসছি। পথে দু'জন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। শুনলুম, তাঁরা পুরীর পুরাতন অধিবাসী এবং উকিল। তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "মাছটা কততে কিনলেন?" আমি দামটা বলতে যাচ্ছি কিন্তু শচীর বকুনিতে চুপ করে গেলুম। শচী বললে "আপনিই বলুন না, কত দাম। আপনি তো লোক্যাল লোক; নিশ্চয় জিনিসপত্রের ঠিক দাম জানেন।" শচীর মনের ভাবটি এই যে, ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই অন্ততঃ ২৲ টাকা বলবেন, আর শচী তাঁকে আসল দামটি বলে 'থ' কোরে দেবে। ভদ্রলোকটি মাছটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, "আনা ছয়েক হবে কি? এর বেশী দাম হওয়া উচিত নয়।" শচী আর 'স্পীকৃটিনট'। কাজেই আমি আসল দামটি বলে দিলুম। ভদ্রলোক শুনে বললেন যে, "বড্ড ঠকিয়েছে।" আর একটু অনুযোগের সুরে বললেন যে, "আপনারা যা তা দাম দিয়ে বড্ড বাজার নষ্ট করেন।" শচীর সেই যে বাক্‌রোধ হ'লো, বাড়ী পৌঁছনো পর্যন্ত সে আর মুখ খোলেনি। শচীর স্ত্রী এবং আমার স্ত্রী আমাদের সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলেন এবং এই ঘটনাটার সাক্ষী আছেন।

পুরীর কথায় মনে পড়ল স্বর্গীয় দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের কথা।

তিনি আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় ও ধনী লোক ছিলেন। তিনি সেবার পুরীতে চেঞ্জে গিয়েছিলেন এবং ভিক্টোরিয়া ক্লাবের কাছে সপরিবারে একটি বাড়ীতে ছিলেন। যদিও কলিকাতার লোক, তবুও

তিনি 'ডাঞ্চিবাবু' ছিলেন না, বরঞ্চ তার উল্টো। সেবারে পুরীতে গিয়ে দিন কতক তাঁর বাড়ীতে ছিলুম। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি বললেন, "চল হে তুষার, স্বর্গদ্বারের বাজারে মাছ কিনে আনি।" আমি বললুম, "এখন সন্ধ্যেবেলা মাছ কিনবেন?" তিনি বললেন, "এখুনি ত মাছ কেনবার time হে, এখুনি ত সস্তা পাওয়া যায়, কারণ, রাত্রের মধ্যেই ওদের সব মাছ বেচে ফেলতে হবে, নইলে সব মাছ পচে যাবে।" আমি বললুম, "তবে চলুন।"

স্বর্গদ্বারের বাজার ছিল সমুদ্রের ধারে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি অনেক জেলে ও মেছুনী মাছের ভাগা দিয়ে বসে আছে। আর প্রত্যেকের সামনে একটি করে তেলের ছোট ল্যাম্প জ্বলছে। আমরা কাছে গিয়ে দেখি প্রত্যেকের সামনে আলাদা আলাদা মাছের ভাগা দেওয়া রয়েছে—কোনও ভাগায় শুধু ট্যাংরা মাছ, কোনও ভাগায় শুধু চিংড়ি মাছ ইত্যাদি। বেশ বোঝা গেল, তারা পরিশ্রম করে

বেছে বেছে মাছ আলাদা করে রেখেছে, যাতে যার যে মাছ যত ইচ্ছা কিনতে পারে। সবই sea fish এবং যদিও সেই দিনই ধরা হয়েছে তবু গরমের সময় বলে তার পরদিন অবধি রাখা যাবে না। বুঝতে পারলুম যে, দেবেনবাবু পুরীতে মাছ কেনার হদিস জানেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর বেশ অভিজ্ঞতা আছে। আর মাছের দর শুনে সকালের চেয়ে বেশ সস্তা মনে হোল। দেবেনবাবু হাতে করে একটি মাছ কেনার থলি নিয়ে গেছলেন; সেই থলি নিয়ে আমরা বাজার ঘুরে ঘুরে দেখলুম যে, একজন মেছুনীর সাম্‌নে অনেক রকমের মাছ ভাগা দেওয়া রয়েছে। দেবেনবাবু তার সামনে বসে মাছের দর করতে লাগলেন আর আমি পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। দেবেনবাবু ট্যাংরা মাছের ভাগাটা দেখিয়ে বললেন, "এটা কত হব?" মেছুনী মনে মনে হিসাব করে বললে, "সাড়ে সাত আনা।" দেবেন-বাবু থলির মুখ খুলে বললেন, "এর মধ্যে দে"; মেছুনী মাছগুলো থলির মধ্যে ঢেলে দিলে। তারপরে দেবেনবাবু বললেন, "এ চিংড়ি মাছের ভাগা কত হব?" মেছুনী আবার হিসেব করে বললে, "ছ আনা।" দেবেনবাবু বললেন, "দে, থলির মধ্যে ঢেলে দে।" তারপরে পমফ্রেট্ মাছের ভাগা দেখিয়ে বললেন, "এর দাম কত?" সে মনে মনে হিসেব করে বললে, "দেড় টাকা।" পমফ্রেট্ মাছও থলির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হলো। এইভাবে আরও দু-চার ভাগা মাছও থলির মধ্যে ঢুকলো। দেবেনবাবু তখন মেছুনীকে বললেন, "এবার তোর সবসুদ্ধ কত হলো বল্।" মেছুনীর মনে খুব আনন্দ, কারণ এত মাছ বিক্রী হচ্ছে। সে পুরো হিসেব করে এবং কিছুটা বাদ দিয়ে বললে, "দু টাকা সাত আনা।" দেবেনবাবু তখন নিজে হিসেব সুরু করলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে মাছের size নম্বর এবং আরও অনেক খুঁটিনাটি ধরে শেষে মেছুনীকে বললেন, "ছ' পয়সা হব?" আমি শুনে টপ্ করে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম, কারণ আমি স্থির জানতুম এবার একটা কাণ্ড হবে। একে ত দু টাকা সাত আনার মাছ ছ'পয়সা

দাম বললে একটা মারামারি ব্যাপার হয়, তার উপর আবার সমস্ত মাছের ভাগা মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ভাবলুম একটা খুনোখুনী না হয়ে যায় না। সত্যি, একটা খুব ঝগড়া হোল। আমি দূরে দাঁড়িয়েছিলুম বলে কথাগুলো শুনতে পেলুম না। মেছুনীটা খুব হাত-পা নাড়তে লাগল আর চ্যাঁচাতে লাগল। দেবেনবাবু কিন্তু নির্বিকার;

তিনি দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর প্রকাণ্ড গোঁপে চাড়া দিতে লাগলেন, কিন্তু কোনও কথা বললেন না। প্রায় পাঁচ মিনিট বকাবকির পর তিনি কী যেন দাম দিয়ে মাছের থলি হাতে করে আমার দিকে এলেন। এসে তিনি বললেন, "খুব বীর পুরুষ ত, পালিয়ে এলে কী বলে?" আমি বললুম, "আপনার 'ছ' পয়সা হব শুনে সেখানে থাকি কী করে? তার উপর তার সমস্ত মাছের ভাগা আপনি ভেঙ্গে দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "মেছুনীর দুটো গাল খেয়ে যদি সস্তায় মাছ কিনতে পারা যায়, তা মন্দ কী।" আমি বললুম, তা সবসুদ্ধ

কততে কিনলেন ?” তিনি বললেন, “উনিশ পয়সা। অনেক দর কষাকষির পর আমি সাড়ে চার আনা অবধি উঠেছিলুম এবং তার উপর আর কিছুতেই উঠতুম না। কিন্তু কাঁহাতক আর বকাবকি করি বল ? সেইজন্য একটা পয়সা sacrifice করে মাছ নিয়ে চলে এলুম।”

আবার এর উল্টো দেখেছি আমার এক জামাইবাবুর জিনিস কেনাতে। তিনি কিনতেন সেরা জিনিস এবং চড়া দামে ; কিন্তু সকলকে বলতেন খুব সস্তায় কিনেছেন। এর জন্য তিনি যে কত দণ্ড দিয়েছেন তার হিসেব নেই। আমার দিদির কাছেও তিনি জিনিসের দাম লুকোতেন। যদিও এ কাজ সোজা ছিল না। কারণ, আমার দিদি সুগৃহিণী ছিলেন এবং জিনিসপত্রের দাম তাঁর বেশ ভালভাবেই জানা ছিল। একদিনের কথা মনে পড়ছে। আমার জামাইবাবুর অবস্থা খুব ভাল ছিল এবং কোন কাজকর্ম করতেন না। ভাল খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসতেন বলে বরাবর নিজে বাজার যেতেন। একদিন বাজার যাবার সময় আমার দিদি বললেন, “এখন ইলিশ মাছের দাম খুব বেড়ে গেছে, অন্য মাছ এনো।” তখনকার দিনে আট আনায় একটি বড় ইলিশ মাছ পাওয়া যেত ; কিন্তু ওই সময়টা কোন কারণবশতঃ ঐ রকম ইলিশ মাছের দাম দেড় টাকা, দু'টাকা হয়েছিলো। জামাইবাবু বললেন, “আরে না না, আমি কি বোকা ছেলে ? এখন কি কেউ ইলিশ মাছ কেনে ? দিনকতক বাদে খুব দর কমে যাবে ; তখন খুব ইলিশ মাছ খাওয়া যাবে।” এই বলে তিনি বাজার করতে গেলেন।

আমি দিদির সঙ্গে গল্প করছি ; ঘণ্টাখানেক বাদে জামাইবাবু বাজার করে ফিরলেন। চাকরটার হাতে দেখি তিনটি প্রকাণ্ড ইলিশ মাছ। সে রকম ইলিশ মাছ সচরাচর চোখে পড়ে না। দিদি রেগে বললেন, “ফের ইলিশ মাছ নিয়ে এলে ? এত মাছ কে খাবে— আমরা ত মাত্র এই ক'জন। নিশ্চয় খুব দাম পড়েছে ?”

জামাইবাবু হেসে বললেন, “পাগল না ক্ষ্যাপা। খুব সস্তা না

পেলে এত মাছ আনি? এক একটি ইলিশ আট আনা রে পড়েছে।" আমার দিদি ধমকে বললেন, "মিথ্যে কথা বলছো?" জামাইবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "বলছি ত দশ আনা করে পড়েছে।"

দিদি—"ফের মিথ্যে কথা?"

জামাইবাবু—"তোমার দিব্যি বলছি—চৌদ্দ আনার এক পয়সাও বেশী নয়।"

দিদি—"তোমার এত মিথ্যে বলতে লজ্জা হয় না?"

জামাইবাবু বুঝতে পেরেছেন বেশীক্ষণ থাকলে বিপদ। তিনি ততক্ষণ সিঁড়ি দিয়ে নামতে স্নুরু করেছেন। নামতে নামতে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "যে কোনও দিব্যি গালতে বল গালছি, তিনটি মাছে তিন টাকার বেশী দিইনি।" বোলে তরতর করে নেমে বাইরের ঘরে চলে গেলেন; আর দু'ঘণ্টা বাড়ীর ভেতরে এলেন না।

একদিন মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে জামাইবাবু আমার সামনে ল্যাংড়া আমের দর করছেন। তিনি দাম শুনে বললেন, "এ আম

নিশ্চয় বিশ্রী, নইলে এত সস্তা হয়!" বিক্রেতা এক আঁচে তাঁকে বুঝে নিলে। সে বললে, "মশায় ভুল হয়েছে; এ আমের দাম সত্যিই বেশী। আমি ওই আমের দাম বলতে এই আমের দাম বলে ফেলেছি।" জামাইবাবু তখন বেশী দাম দিয়ে অতি সন্তুষ্ট চিত্তে ওই আম কিনলেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ভাল জিনিসের দাম বেশীই হবে। আর সস্তার তিন অবস্থা।

একবার তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছেন আর আমার বড় পিসিমার সঙ্গে গল্প করছেন। আমার বিধবা বড় পিসিমা বললেন, "আজকাল খাঁটি ঘি মোটেই পাওয়া যায় না, আর যা পাওয়া যায় তার দর অত্যন্ত বেশী।"

জামাইবাবু "বলেন কী বড়পিসিমা। খাঁটি ঘি ত একটু চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। আমার এক বন্ধু ঘিয়ের ব্যবসা করছেন। তিনি একেবারে খাঁটি গাওয়া ঘি দিয়ে থাকেন এবং দামেও খুব সস্তা। আমি সেখান থেকেই ঘি কিনি। বলেন ত আপনার জন্য আমি ভাল ঘি সস্তায় এনে দিতে পারি।"—

পিসিমা—"তা'হলে ত বাবা ভালই হয়। ভেজাল ঘি খেতে আমাদের মন খুঁৎখুঁৎ করে। কী মেশায় তা ত জানি না। আমাকে যদি সের পাঁচেক খাঁটি গাওয়া ঘি যোগাড় করে দিতে পার তাহলে আমার খুব উপকার করা হয়। তা কত করে দাম পড়বে?"

জামাইবাবু—"আমি তো তিন টাকা করে গাওয়া ঘিয়ের সের পাই।"

পিসিমা—"বল কি বাবা, মোটে তিন টাকা? আমি তো পাঁচ টাকা সের দিয়েও খাঁটি ঘি পাই না।"

জামাইবাবু—"দেখুন বাজার করা অত সোজা জিনিস নয়। আমি অনেক ঠকে বাজার করতে শিখেছি। আচ্ছা ঘি তো আনি, তারপর দেখবেন কি রকম জিনিসটা।"

পরদিন জামাইবাবু দশ সের খাঁটি গাওয়া ঘি এনে হাজির।

পিসিমা ঘি পরীক্ষা করে বললেন, "এতো অতি চমৎকার ঘি দেখছি। কেমন দানাদার আর কি স্নুগন্ধ। তা বাবা, দশ সের আনলে কেন? পাঁচ সের হলেই যথেষ্ট হোত।" জামাইবাবু বললেন, "পাঁচ সেরই আনতুম, তবে দশ সের নেওয়াতে আরও কিছু সস্তা পেলুম। তাই দশ সেরই নিয়ে নিলুম।" পিসিমা জিগেস করলেন, "তিন টাকার চেয়েও সস্তা?" জামাইবাবু বললেন, "তাই তো বলছি পিসিমা, আমি সবস্নুদ্ধ পঁচিশ টাকা দিয়েছি।" পিসিমার শুনে খুব আনন্দ এবং তিনি শতমুখে জামাইবাবুর স্নুখ্যাতি করতে লাগলেন। "এমন বাজার কেউ করতে পারে না আর এমন খাঁটি জিনিসও কেউ আনতে

পারে না"—এই কথাই পিসিমা বার বার আমার জ্যেঠাইমা ও কাকীমাদের বলতে লাগলেন। আর জামাইবাবু তোঃ আনন্দে আত্মহারা। তাঁর তখনকার মুখের ভাব দেখলে মনে হোত যেন

রাজ্য জয় করে এসেছেন। তিনি যে সস্তায় মাল কিনতে পারেন এ সার্টিফিকেট তাঁর জীবনের একটি প্রধান আনন্দের বিষয় ছিল। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে তিনি আড়াই টাকা সেরেও ঘি কেনেননি, তিন টাকা সেরেও না। তিনি ঘি কিনেছিলেন ডবল দামে এবং সেটা তাঁর নিজের পকেট থেকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কি হয়। গেলই বা কিছু টাকা পকেট থেকে? কিন্তু সকলে তো বলছে যে তাঁর মত বাজার করতে কেউ পারে না।

আবার পাটনার অন্নদাকুমার ঘোষ মহাশয়কে দেখেছিলুম যে তাঁর সর্বদা ভয় পাছে কেউ তাঁকে ঠকায়। তিনি ছিলেন দেবতার মতন লোক এবং অত্যন্ত সরল। তিনি খুব চেঁচামেচি করতেন কিন্তু সে সব ছিল অন্তঃসারশূন্য। যারা তাঁকে চিনতো না তারা তাঁর চীৎকার শুনলে মনে করতো লোকটি বুঝি ভীষণ রাগী কিন্তু যারা তাঁকে চিনতো, তারা জানত এসব গালাগালির কোন মূল্যই নেই এবং যদিও তারা তাঁকে খুব ভক্তি করত কিন্তু গ্রাহ্য করত না। সেবার আমি তাঁর মাখনিয়া কুঁয়ার বাড়ীতে নতুন গিয়েছি। তাঁর সঙ্গে দু-তিন দিন থাকব। আমার যাবার পরদিন সকালে তিনি বললেন, "চল হরিসভায় যাই।" আমরা যাবার সময় বাড়ীর উঠানে এসে দেখলুম যে এক মেছুনী গোটা কতক পোনা মাছ নিয়ে বসে আছে। অন্নদাবাবু মেছুনীকে দেখেই ভীষণ চীৎকার করতে আরম্ভ করলেন। "এই তুম কাহে হিঁয়া বৈঠা হ্যায়, তোম বড়া বদমাশ হ্যায়, আভি হামকো ঠকায়গা। মাছ বেচনে কো যায়গা নেহি মিলা?—আভি নিকালো হিঁয়াসে।"

মেছুনী নির্বিকার, কারণ সে তাঁকে চেনে। মেছুনী বললে— "আরে চিল্লাতা হ্যায় কাহে বাবু? কেতনা দাম দেওগে বোল না।" অন্নদাবাবু চীৎকার করে বললেন, "তুম বোলো না কেতনা করকে? লেকিন, ঠিক দাম বোলো, হাম জানতা হ্যায় তুম হামকো ঠকলানে আয়া। যা সত্যি দাম ঐ বোলো নেই তো আভি নিকাল দেঙ্গে।"

মেছুনী একটু ভেবে বললে—"আচ্ছা আপ বারা আনা করকে সের দিজিয়ে।" বার আনা শুনে অন্নদাবাবুর ভীষণ চীৎকার। "আভি ভাগো হিঁয়াসে, হামকো ঠকায়গা ? তুম আভি ভাগো।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আমাকে ঠকাবে ? বেটী আমাকে

বোকা পেয়েছে ?" মেছুনী বললে, "আরে এতনা চিল্লাতা হ্যায় কাহে বাবু ? তুম কেতনা করকে দেওগে বোলো না।" অন্নদাবাবু একটু ভেবে বললেন, "আট আনা সের কা এক পয়সা জাস্তি নেহি দেগা।"

মেছুনী—"আচ্ছা বাবু আট আনা সের করকে লিজিয়ে।"

আমি ভাবলুম, ব্যাপারটা এইখানেই চুকলো। কিন্তু অন্নদাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে আমি আশ্চর্য হলুম। আনন্দের বদলে দেখলুম

মুখখানা অন্ধকার। তিনি আমাকে বললেন, "দেখলে তো, বেটী আমাকে কি ভাবে ঠকালে? এই জন্যেই আমি বেটীকে আগে থেকেই তাড়িয়ে দিচ্ছিলুম?" আমি বললুম, "সেকি ও ঠকালে কি করে? আপনি যা দর বললেন ওতো তাতেই রাজি হোল।"

অন্নদাবাবু—"আরে সেই জন্যেই তো বলছি ঠকালে। ও যখন এক কথায় আমার দরে রাজি হয়েছে তখন তুমি কি বলতে চাও, ও আমাকে ঠকায়নি?"

তারপর হরিসভায় যাওয়া এবং ফিরে আসা—সমস্ত রাস্তা তিনি আমাকে বোঝাতে লাগলেন যে কি ভীষণ তিনি ঠকেছেন।

এইবার সেল থেকে সস্তায় জিনিস কেনার একটা ঘটনা বলব। ক'বছর আগে আমার সম্পর্কীয় এক খুড়ো সেলে যেতে আরম্ভ করলেন, আর সস্তার দোহাই দিয়ে কিছু কিছু জিনিস কিনতে লাগলেন। প্রায় সব জিনিসই পুরান ও নড়বড়ে। তবে তার মধ্যে অবশ্য দু-একটা ভাল জিনিসও ছিল। আমার সেই খুড়ো আমার স্ত্রীকে বোঝালেন যে অনেক সময় সেলে খুব সস্তায় ভাল জিনিস পাওয়া যায়। আর দুপুরবেলা ভাত খেয়ে সেলে গেলে সময়টা বেশ কেটে যায়। আমার স্ত্রী রাজি হলেন এবং মধ্যে মধ্যে এ সেল ও সেল ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারটা আমার নজরে এলো যখন দেখলুম যে, আমার স্ত্রী সাড়ে তিন পায়া চেয়ার, কানা ভাঙ্গা ডেক্‌চি, পুরান গ্রামোফোন রেকর্ড, এইসব বাড়ীতে আনতে স্থরু করলেন। যদিও এ কাজ আমার পছন্দ ছিল না, তবুও আমার স্ত্রীকে আমি কিছু বলিনি। কারণ আমি জানতুম যে শীঘ্রই তাঁর শখ মিটে যাবে।

একদিন দেখি যে, আমার স্ত্রী খুব মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন। আমি জিগেস করলুম—"কি হলো?" তিনি বললেন, "আমি আর কাকাবাবুর সঙ্গে কক্ষণো সেলে যাব না। আমি একটা ভাল টেবিল পছন্দ করলুম আর কাকাবাবুরও সেটা পছন্দ হলো! তিনি বললেন

যে তিনি সেটা নিজের জন্যে ডেকে নেবেন। তা' আমিও ছাড়বো না …আমি মণ্টুকে পাঠাচ্ছি, সে সেলের দিন আমার হয়ে ডাকবে।"

তার দিন কতক পরের ঘটনা—একদিন দেখি আমার স্ত্রী মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বসে আছেন। আমি বললুম, "আবার ব্যাপার কি?" তিনি বললেন, "সেই টেবিলটা পাওয়া গেল না।" জিগেস করলুম—"কেন? তোমার কাকাবাবু বুঝি সেটা ছাড়লেন না?" আমার স্ত্রী বললেন, "কাকাবাবুও সেটা পাননি। আর একজন সেটা ডেকে নিয়েছে। টেবিলটার দাম বড় জোর পনের টাকা—আর আমি আশা করেছিলুম টাকা পঁচিশের মধ্যেই সেটা পাবো। তবে সেটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল বলে আমি মণ্টুকে বলেছিলুম যে, যত টাকা লাগে লাগুক, তুই কিন্তু কিছুতেই টেবিলটা ছাড়বি না। আর মণ্টুও সেইমত ষাট টাকা অবধি উঠেছিল কিন্তু সেই লোকটা পঁয়ষট্টি টাকায় ওটা কিনলে। মণ্টু যত ডাকে, সেও তত ডাকে—কিছুতেই ছাড়ে না। দেখ দেকিনি, একবার অত্যাচারটা। টেবিলটা কিন্তু বেশ ছিল আর আমি মনে করেছিলুম যে ওটা পালিশ করিয়ে পাশের ঘরে রাখবো—কিন্তু সে লোকটা কিছুতেই ছাড়লে না।"

আমাদের এই কথা হচ্ছে, এমন সময় আমার সেই খুড়ো এসে হাজির। তিনি হাসিমুখে আমার স্ত্রীকে বললেন, "সেদিন অযথা তোমার সঙ্গে তর্ক করেছিলুম। পরে ভেবে দেখলুম যে টেবিলটা তোমার যখন অত পছন্দ তখন সেটা তোমার জন্যেই কিনবো। সেই জন্যে আমার এজেন্টকে বলেছিলুম যত টাকাই লাগুক না কেন ওটা চাই।"

আমার স্ত্রী অবাক হয়ে বললেন, "বলেন কি? ওটা আপনি নিয়েছেন! কত দাম পড়ল?" আমার খুড়ো বললেন, "সেকথা আর বলো কেন! কোত্থেকে একটা রোগামত ছোঁড়া জুটেছিল। তারও ঝোঁক সে টেবিলটা নেবেই নেবে। মনে করেছিলুম টাকা পঁচিশের মধ্যে পাওয়া যাবে কিন্তু তা হলো না। আমার এজেন্ট

আমার হুকুমমত যত ডাকে সে বেটাও ততই ওঠে। যাইহোক শেষ পর্যন্ত সেই ছোঁড়াটাকে কাত করে টেবিল আমি কিনেছি। এখন

পঁয়ষট্টিটা টাকা দাও তো, টেবিলটা নিয়ে আসি। একবার মজা দেখ। সেই ছোঁড়াটা ছাড়া আর ডাকবার লোক কেউ ছিল না। সেই গোল বাধিয়ে দরটা এত চড়িয়ে দিলে।"

আমার স্ত্রী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বললেন, "কাকাবাবু, সে আর কেউ নয়। সে হচ্ছে আমাদের মণ্টু। আপনি যখন বললেন টেবিলটা আপনিই নেবেন তখন আমি মণ্টুকে পাঠিয়েছিলুম যাতে সে আমার জন্য টেবিলটা ডেকে নেয়। তা আমি কি করে জানবো যে আপনিও আমার জন্যে ডাকবেন?"

শুনে আমার খুড়োর তো বাক্‌রোধ হলো! একটু বাদে বললেন, "তবে কি আমরা নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি করে এত দর চড়িয়ে

দিলুম! আমাদের মতন বোকা লোক ত কোথাও দেখিনি! যাক্‌গে, ঢের হয়েছে, আর সেলে-টেলে যাচ্ছি না।" আমার স্ত্রীও সেই অবধি সেলে সস্তায় জিনিস কিনতে যান না। অবশ্য পঁয়ষট্টি টাকা দিয়ে সে টেবিলটি তাঁকে নিতে হয়েছিল।

মসী বড় না অসি বড়?

আমি খবরের কাগজের সম্পাদক। বহু সভাতে আমাকে অনেকে তাই প্রশ্ন করেন, "এটা কি সত্যি যে, দি পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান দি সোর্ড?" অর্থাৎ কিনা কলম বড় না অসি বড়? সৈনিকেরা অবশ্য আমার সঙ্গে একমত হবেন না, তবে আমি মনে করি যে, তলোয়ারের চেয়ে কলমই বেশী ক্ষমতাশালী। একবার এক মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে এক মসীজীবী কেরানীর মতদ্বৈধ হয়েছিল, এবং তার ফল কি হয়েছিল সেই কথাই আজ আমি বলবো।

একথা আপনারা অনেকেই জানেন যে, যাঁরা গভর্ণমেণ্ট অফিস থেকে পেন্‌শন্‌ আনতে যান—তাঁদের আইডেন্টিটি অর্থাৎ কিনা তাঁরা যে আসল লোক তার পরিচয় দিতে হয়।—তাঁদের পরিচয় সম্বন্ধে পেন্‌শন্‌ অফিসে একটা বর্ণনা থাকে, যেমন তাঁদের আকার কেমন, কোন একটা বিশেষ চিহ্ন আছে কিনা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ অনেকদিন আগেকার কথা, তখন বৃটিশ রাজত্ব চলছে, এক জবরদস্ত জঙ্গী সাহেব নিজের পেন্‌শন্‌ নিজেই আনতেন। এই সাহেব মীরাটে চাকরি করতেন ও পরে রিটায়ার করে কলকাতায় বাস করেন। তাঁকে পেন্‌শন্‌ অফিসের লোকেরা চিনতো—তাই কখনো কোন গোলমাল হয়নি।—কিন্তু একবার গোল বাধলো।

সেদিন কি কারণে জানি না, সেই জঙ্গী সাহেবের মেজাজটা খুব রুক্ষ ছিল। আর মজা এই, সেদিনই যে কেরানীটি পেন্‌শন্‌ দিচ্ছিলেন তাঁর মেজাজটাও খুব শরীফ ছিল না। এই কেরানীটি ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগতেন ও শরীরের অবস্থা অনুযায়ী তাঁর মেজাজও কখনো গরম, কখনো ঠাণ্ডা থাকতো। মেজাজ খারাপ হলে তিনি অনেক সময় এমন কাজ করতেন কিংবা এমন কথা বলতেন যা অন্য সময় করতেন না। রাগ হ'লে তাঁর ভয়-ডরও থাকতো না।

এখন সেই দিনের কথা বলি।

মিলিটারী সাহেবটি তাড়াতাড়িই পেন্‌শন্ চাইছিলেন আর কেরানীটি তাঁকে বলছিলেন, 'ওয়েট, ওয়েট' অর্থাৎ 'অপেক্ষা করুন'। বার কতক এরকম হবার পর সাহেবের গেল মেজাজ বিগড়ে এবং রাগের চোটে তিনি কেরানীটিকে বলে উঠলেন "জানো, আমি কে? এখুনি এক কোপে তোমার মুণ্ডু উড়িয়ে দিতে পারি!"

কেরানীটির মেজাজ সেদিন সপ্তমে চড়ে ছিলো। তিনি সাহেবের নাকের সামনে তাঁর পেন্সিলটি তুলে বললেন, "আমার তরোয়াল নেই —সুতরাং তোমার মুণ্ডু হয়তো কাটতে পারবো না, কিন্তু এই পেন্সিল দিয়ে তোমার সামনের দুটো দাঁত ভেঙে দিতে পারি, তা জানো?"

শোনামাত্র সাহেব অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন, তবে অফিসের অন্যান্য লোকেরা এসে পড়ায় ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়াতে পারলো না। সাহেব পেন্‌শন্ নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

সাহেব বাড়ী চলে যেতে বাবুটি বিড় বিড় করে বললেন, "দাঁড়াও,

তোমাকে মজা দেখাচ্ছি! কলমের এমন খোঁচা মারবো যে, সামনের দুটো দাঁত থাকবে না!"

এর পরের মাসের কথা। সাহেব আবার পেন্‌শন্ নিতে এসেছেন এবং সেই পূর্বোক্ত কেরানীটি তাঁর নিজের স্থানে বসে আছেন। সাহেব পেন্‌শন্ চাওয়াতে বাবুটি বললেন, "আপনাকে এর আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না! সেইজন্য আপনার চেহারাটা আমাদের রেকর্ডের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো।" এই কথা বলে বাবুটি সাহেবের পেন্‌শন্ বইটি সামনে খুলে সাহেবকে বললেন, "আপনি একবার হাঁ করুন তো, আপনার দাঁত দেখবো।"

সাহেব রেগে তাঁর বত্রিশটি দাঁত বের করে বললেন, "আমি তোমার মতন ডিস্‌পেপ্‌টিক নই—এই দেখ আমার সব দাঁতগুলো ঠিক আছে।" বাবুটি সাহেবের দাঁত দেখে মাথা নেড়ে বললেন, "উহুঁঃ, এতো বড় মুশকিল হ'ল দেখছি। খাতায় লেখা রয়েছে যে আপনার সামনের দাঁত দু'টো নেই, অথচ আমি দেখছি যে, আপনার বত্রিশটি দাঁতই বর্তমান। বুড়ো বয়সে দাঁত পড়ে গেলে আর তো দাঁত ওঠে না। এরূপ ক্ষেত্রে আমি আপনাকে পেন্‌শন দিই কি করে?" সাহেব শুনে বললেন, "চালাকি পেয়েছো! বরাবর আমি এখানে পেন্‌শন্ নিচ্ছি, আর এখন পেন্‌শন্ দেবে না!"

বাবুটি উত্তর করলেন, "তা আমি কি করবো? আমি তো গভর্ণমেণ্টের টাকা যাকে-তাকে দিতে পারি না!" এই সব গোলমাল শুনে অফিসের অন্যান্য লোকেরা এসে সাহেবকে বললেন, "পেন্‌শন্ বাবুর কোন দোষ নেই। বইয়ের বর্ণনার সঙ্গে আপনার চেহারা যখন মিলছে না, তখন বাবু কি করবে?" আপনার পুরোন অফিস থেকে আপনার আইডেণ্টিটি আনিয়ে নিন না।" সাহেব বললেন, "আমি এখন খাবো কি? আমার সেই মীরাটের রেজিমেণ্ট এখন কোথায় বদলি হয়ে গেছে আমি জানি না। সেখান থেকে আমার আইডেণ্টিটি আনাতে গেলে অনেক দেরী হবে।" পেন্‌শন্ বাবুটি বললেন, "আমরা তার

কি জানি ?" এই কথা শুনে সাহেব রাগে গরগর করতে করতে চলে গেলেন।

বাড়ীতে সাহেবের স্ত্রী ছিলেন খাণ্ডারণী। বিনা পেন্‌শনে বাড়ী ঢোকাতে তিনি সাহেবের হাঁড়ীর হাল করলেন। বললেন, "যেখান থেকে পারো পেন্‌শন্ নিয়ে এসো, নইলে তোমার একদিন কি আমার একদিন।"

সাহেব বিমর্ষভাবে ক্লাবে গিয়ে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন ; কিন্তু কেউ এমন বুদ্ধি দিতে পারলেন না যাতে তখুনি পেন্‌শন্ পাওয়া যায়। সাহেবের বন্ধুরা সকলেই বললেন, "এ মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। এর আইনকানুন বড়ই শক্ত। তুমি তোমার পুরোন রেজিমেণ্ট থেকে আইন অনুযায়ী তোমার আইডেন্টিটি আনবার চেষ্টা করো। তবে এক কাজ করতে পারো, তুমি কলকাতার পেন্‌শন্ অফিসকে একটা কড়া চিঠি লিখে দেখতে পারো।" সাহেব অগত্যা তাতেই রাজি হলেন এবং তার পরদিনই মীরাটে ও কলকাতার পেন্‌শন্ অফিসকে পত্র লিখলেন।

দিনের পর দিন যায়। সাহেবের স্ত্রীর মেজাজ ক্রমেই খারাপ হ'চ্ছে ; বাড়ীতে অর্থাভাবে সুখ-সাচ্ছন্দ্য নেই। সাহেবকে উঠতে বসতে খোঁটা খেতে হচ্ছে, মেমসাহেব দিনরাতই দুঃখ করেন, "এমন অপদার্থের হাতে পড়েছিলুম, যে নিজের পেন্‌শন্‌টা অবধি আনতে পারে না। এই বুড়ো বয়সে আমাকে ভাত-কাপড়ের কষ্ট পেতে হচ্ছে। উনি আবার মিলিটারী সাহেব! প্রকাণ্ড গোঁফ থাকলেই মরদ হওয়া যায় না। মরি, মরি, সেই গোঁফ আবার মোম দিয়ে খাড়া করা হয়!" কখনো বা ভীষণ রেগে গিয়ে বলেন, "বেরোও আমার সামনে থেকে, কাল যদি টাকা না আনতে পারো তবে বাড়ী ঢুকতে দোব না।"

কুড়ি-পঁচিশ দিন পর সাহেব পেন্‌শন্ অফিস থেকে জবাব পেলেন। তারা লিখেছে :—"আপনার পত্র পাইলাম, আমরা

এখনই এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করিতেছি।" আরও দিন পাঁচেক পরে সাহেব মীরাট থেকে উত্তর পেলেন যে, তাঁর পত্র 'যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরের মাসের পেন্‌শনের দিনে সাহেব পেন্‌শন্ অফিসে গিয়ে দেখলেন যে, সেই বাবুটি ডেস্কের সামনে বসে আছেন। সাহেবের তখন বীরত্ব জল হয়ে গিয়েছে। বাবুটিকে অনেক অনুনয় বিনয় করলেন এবং তার 'মুণ্ডু কাটবেন' বলেছিলেন বলে অনেক ক্ষমা প্রার্থনাও করলেন। বাবুটির কিন্তু সেই একই কথা, "বর্ণনা না মিললে আপনাকে পেন্‌শন্ দিই কি করে?" সাহেব সেবারেও ক্ষুণ্ণমনে শূন্য হাতে বাড়ী ফিরে গেলেন।

বাড়ী ফিরতেই মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "পেন্‌শন্ এনেছো?" সাহেব অনেক কাকুতি-মিনতি করে জানালেন যে, তিনি পেন্‌শন্ পাননি। "আমি অনেক অনুরোধ, এমন কি ক্ষমা প্রার্থনাও করেছিলুম, কিন্তু সেই বাঙালীবাবুটি কিছুতেই শুনলে না।" মেমসাহেব বহু কষ্টে একমাস চালিয়েছেন। এখন আর একমাস কি করে চালাবেন ভেবে রণচণ্ডীমূর্তি ধারণ করলেন। সাহেবের মোচার মত গোঁফ খামচে ধরে বললেন, "এখুনি এই গোঁফ কামিয়ে এসো; আর আজ থেকে গাউন পরো। যে নিজের অর্জিত পেন্‌শন্ ঘরে আনতে পারে না—সে মেয়ে মানুষেরও অধম।"

সেই দিন সাহেব ক্লাবে গিয়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধবের কাছে আবার এই কথাটি পাড়লেন। সকলেই সাহেবের জন্য দুঃখিত, কিন্তু কেহই এমন কোন সৎ পরামর্শ দিতে পারলেন না যাতে সাহেব তখুনি পেন্‌শন্‌টি পান। এক বন্ধু বললেন, "তুমি মীরাটে ও কলকাতায় আবার রিমাইণ্ডার দিয়ে চিঠি লেখো।" কিন্তু গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্মচারী আর এক বন্ধু বললেন, "ওতে কোন আশু ফল হবে না—আমি সিভিল কর্মচারী আর তুমি মিলিটারী কর্মচারী। আমরা দু'জনেই গভর্ণমেণ্ট অফিসের হালচাল জানি। তারা টাকার

ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নিতে চাইবে না এবং তাড়াতাড়িও কিছু করবে না। তারা মাস খানেক বাদে আবার জবাব দেবে—'your grievance is receiving our prompt attention—'

—অর্থাৎ কিনা 'আমরা খুব সত্বরই তোমার নালিশ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছি।' এতে তোমার কি লাভ হবে?"

এই সব কথা শুনে সাহেব অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন এবং গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। খানিকক্ষণ বাদে তিনি বন্ধুদের বললেন, "তোমরা আমার বাড়ীর অবস্থা বুঝছো না। আজ গিন্নী আমার গোঁফ ধরে ওঠবোস করিয়েছেন। কাল নোড়া দিয়ে আমার দাঁতগুলো ভাঙবেন।"

এক বৃদ্ধ সাহেব নীরবে একপাশে বসে চুরুট খাচ্ছিলেন এবং এই সব কথা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, "আমি এর উপায়

করে দিতে পারি, যদি আমার কথা শোন। তবে এতে তোমার কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হবে। আর জানতো হিন্দুরা বলে 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' আর আমরা বলি, 'হাফ এ লোফ ইজ বেটার ছান নো ব্রেড'—তবে তোমাকে অর্ধেক ত্যাগ করতে হবে না, সামান্য কিছু ত্যাগ করলেই চলবে।" পেন্‌শনার সাহেব এই কথা শুনে আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলেন, "ভাই, তোমার মতলবটি বাতলিয়ে দাও, আমি তোমার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো।"

বৃদ্ধ সাহেব উত্তর করলেন, "কেন, তুমিই তো তোমার নিজের উপায় বাতলিয়ে দিয়েছো। তুমি তো বললে যে, তোমার গিন্নী নোড়া দিয়ে তোমার সমস্ত দাঁতগুলো উপড়ে ফেলবে। তার চেয়ে কেন তুমি নিজেই সামনের দুটো দাঁত তুলে ফেল না, তাহলে কালই তো পেন্‌শন্‌টা পেয়ে যাও? মীরাটেও চিঠি দিতে হবে না, আর আইডেন্টিটিও আনাতে হবে না। তোমার বয়েসও তো হয়েছে—ও দাঁত আর কতদিনই বা থাকবে? আর আজকাল এমন পেন্‌লেস এক্সট্র্যাকশনের ব্যবস্থা হয়েছে যে, তোমার দাঁত তুললে তুমি জানতেও পারবে না। এই তো সামনেই চৌরঙ্গীতে ডাক্তার আর আহমেদ রয়েছেন। তিনি দুটো দাঁতও তুলে দেবেন আর বাঁধিয়েও দেবেন। সেই দাঁত পরে থাকলে কেউ জানতেও পারবে না যে তোমার দুটো দাঁত নেই। কেবল পেন্‌শন্‌ আনবার দিন বাঁধানো দাঁত দুটো বাড়ীতে খুলে রেখে যাবে।"

এই প্রস্তাব শুনে সাহেবের সব বন্ধুরাই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং সকলেই বললেন, "এর চেয়ে সোজা আর ভাল প্ল্যান হতে পারে না।" তাঁদের মধ্যে আবার যাঁরা আগে দাঁত তুলিয়েছিলেন তাঁরা জানালেন যে আজকাল দাঁত তোলাতে কোন কষ্ট নেই। মিলিটারী সাহেবও তখন এই প্রস্তাবে রাজি হলেন।

এর দিন চারেক পরের কথা। সাহেব বাড়ী থেকে বেরোবার সময় হাসিমুখে মেমসাহেবকে বলে গেলেন, "আজ যদি পেন্‌শন্‌

আনতে না পারি তো তুমি আমার সব দাঁতগুলো নোড়া দিয়ে ভেঙে দিও।”

পেন্‌শন্‌ অফিসে গিয়ে সাহেব দেখলেন যে সেই ডিস্‌পেপ্‌টিক বাবুটি ডেস্কের সামনে বসে আছেন। সাহেব সামনে আসতেই বাবুটি বললেন, “আপনার identity এনেছেন কি?” সাহেব একগাল হেসে বললেন, “এই দেখুন আমার আইডেন্টিটি। এবার

বর্ণনায় মিলছে তো?” কেরানী বাবুটি সাহেবের পেন্‌শন্‌ তখুনি দিয়ে দিলেন। সাহেব টাকাগুলি পকেটে নিয়ে যখন তাঁর কাছে হাসিমুখে বিদায় নিচ্ছেন, তখন বাবুটি তার পেন্সিলটি সাহেবের গোঁফের সামনে নেড়ে বললেন, “সাহেব, কলমের খোঁচাটি কেমন বুঝলে তো? তোমার তলোয়ার বড় না আমার কলম বড়?” সাহেব বাঙালীবাবুর দুটি হাত ধরে বললেন, “তোমার কলমই বড়।”

একটি অলৌকিক ঘটনা

আমার বই 'বিচিত্র কাহিনী'তে আমার জীবনের একটি অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহা পড়িয়া বহু বন্ধু-বান্ধব আরো ঐরূপ ঘটনা আমাকে লিখিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই, কেননা, মানুষের মনে সমস্ত ভয়ের মধ্যে মৃত্যুভয় সর্বাপেক্ষা প্রবল। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মৃত্যু অনিবার্য এবং মৃত্যুর পর মানুষের যে কি হয় সে সম্বন্ধে কেহই সঠিক কিছু বলিতে পারেন না। এই জন্যই ভৌতিক গল্পের উপর মানুষের একটা সাধারণ আকর্ষণ আছে।

মৃত্যুর পরেও আত্মা জীবিত থাকে ইহা জানিতে পারিলে মানুষের দুঃখ বহুল পরিমাণে লাঘব হইয়া যায়। পতি-হীনা স্ত্রী, সন্তান-হীন পিতা-মাতা—সকলের মনেই মৃত প্রিয়জনের সহিত মিলিত হইবার একটি অদম্য আকাঙ্ক্ষা থাকে; তাই "বিচিত্র কাহিনী"তে আমার 'মৃতের সহিত সাক্ষাৎ' পড়িয়া বহুজনে ঐজাতীয় অলৌকিক ঘটনা লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ঐরূপ ঘটনা তো ফরমাশ মাফিক লেখা চলে না। তাহা হইলে সেইগুলি সাধারণ চলিত ভূতের গল্প হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্য নিজের জানা কিংবা এমন ব্যক্তির জানা, যাঁহার উপর আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে, এইরূপ প্রত্যক্ষ ঘটনাই লেখা আমি কর্তব্য মনে করি। এই লেখার দ্বারা যদি একটিও শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সামান্য শান্তি দিতে পারি—তবে তাহাই হইবে আমার পরম সান্ত্বনা।

এইরূপ একটি ঘটনা আজ আমি বর্ণনা করিতেছি যাহা এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক মহাশয়ের পরিবারে ঘটিয়াছিল। এই ঘটনাটির দ্বারা এই তথ্যই প্রমাণিত হয়

যে, মানুষ মৃত হইলেও তাহার আত্মা বিনষ্ট হয় না,—আত্মারা পৃথিবীর আকর্ষণ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না এবং তাঁহাদের 'ফেলিয়া যাওয়া' আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য সময়ে সময়ে চিন্তাও করিয়া থাকেন।···এইবারে আসল ঘটনাটি বিবৃত করিতেছি।

শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় শ্রীসারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী লীলাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর শ্রীমতী লীলার সহিত একটি পরিচারিকা মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে আসে। তাহার নাম ছিল হরিদাসী। হরিদাসী লীলাদেবীকে মানুষ করিয়াছিল বলিয়া সে আর ফিরিয়া যাইতে চাহিল না, সে এলাহাবাদে মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতেই রহিয়া গেল। মল্লিক মহাশয়ের স্ত্রী মধ্য বয়সে দুইপুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে বহুদিন তিনি শয্যাগত ছিলেন এবং এই সময় হরিদাসী তাঁহার প্রভূত সেবা করিয়াছিল। রোগকষ্টের ভিতর ধর্মপ্রবণা লীলাদেবীর একটি প্রধান সান্ত্বনা ছিল, শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। ইহার আরো একটি কারণ ছিল ; যখন বড় বড় ডাক্তারেরা তাঁহার রোগ যন্ত্রণা কমাইতে অপারগ হইলেন, তখন শ্রীকেশবানন্দ মহারাজ প্রায় অলৌকিকভাবে— শুধু যে তাঁহার যন্ত্রণা লাঘব করিলেন তাহাই নয়, বহুদিন শয্যাগত লীলাদেবীকে তিনি হাঁটাইতে সক্ষম করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন লীলাদেবী মন্ত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন কেশবানন্দ তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, লীলাদেবীর মন্ত্র গ্রহণের আবশ্যকতা নাই, কেননা, তিনি এমনিতেই তাঁহার স্বাভাবিক ধর্মপ্রবণতার জন্য যথেষ্ট আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীমতী মল্লিকের স্বর্গারোহণ হইল। এই সময় মল্লিক মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতি, হরিদাসীর হাতে লালিত হইতেছিল। জ্যোতি কিছু বড় হইলে সে স্বভাবতঃই হরিদাসীকে সম্পূর্ণরূপে মানিত না ; ইহাতে বুড়ীর রাগ হইত এবং একদিন সে

মল্লিক মহাশয়কে বলিল যে, জ্যোতি যখন তাহার কথা শোনে না তখন সে আর এলাহাবাদে থাকিবে না। মল্লিক মহাশয় বিশেষভাবে তাহাকে অনুরোধ করিলেন যাহাতে সে মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে থাকে, কিন্তু তাহাতে সে রাজী হইল না। সে কলিকাতার নিকট তাহার গ্রামে ফিরিয়া গেল। মল্লিক মহাশয় তাহাকে ১৫৲ টাকা করিয়া মাসিক পেন্‌শন্ পাঠাইতেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর সহসা মল্লিক মহাশয় হরিদাসীর নিকট হইতে একখানা পত্র পাইলেন। এই পত্রে তাঁহাকে শ্রীবিভূতিভূষণ মল্লিক বলিয়া সম্বোধন করা হয়। ইহাতে মল্লিক মহাশয় আশ্চর্যান্বিত হন, কারণ এলাহাবাদে বহুদিন বাস করিয়াও যে হরিদাসী তাঁহার নাম জানে না, ইহা তাঁহার সম্ভবপর বোধ হইল না। শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক মহাশয় ভাবিলেন যে, হরিদাসীর মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া হরিদাসীর মাসিক ১৫৲ টাকা পেন্‌শন্ আত্মসাৎ করিতেছে। তিনি হরিদাসীর সম্বন্ধে সঠিক জানিবার জন্য কলিকাতার কোন বিশিষ্ট আত্মীয়কে পত্র লিখিলেন, কিন্তু বিধুবাবুর এই আত্মীয় এক মাসের মধ্যেও হরিদাসীর কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না। ইহাতে বিধুবাবু হরিদাসীর পেন্‌শন্ বন্ধ করিয়া দিলেন।

পেন্‌শন্ বন্ধ হওয়াতে হরিদাসী তাঁহাকে আপনার দুঃখ-দুর্দশার কথা জানাইয়া পত্র লিখিল এবং পুনরায় তাঁহাকে শ্রীবিভূতিভূষণ মল্লিক বলিয়া সম্বোধন করিল। ইহাতে মল্লিক মহাশয়ের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, হরিদাসী আর জীবিত নাই। ইহাতে তিনি পেন্‌শন্‌ও আর পাঠাইলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে বিধুবাবুর আত্মীয় শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার তাঁহার চক্ষু চিকিৎসার জন্য বিলাতে যান। বিলাতে থাকাকালে তিনি একদিন 'স্যার অলিভার লজ সোসাইটি'র কোন এক পারলৌকিক সভা দেখিতে যান। এই সভার একজন মিডিয়ম মারফত

BY AIR MAIL

AIR LETTER

IF ANYTHING IS ENCLOSED THIS LETTER WILL BE SENT BY ORDINARY MAIL.

Hon'ble Justice B. Malik. Bar-at-law
Chief Justice
Allahabad High Court
Allahabad
India

First fold here

Second fold here

To open cut here

Sender's name and address:-
P. K. Sarkar
78, Teignmouth Road
London

To open cut here
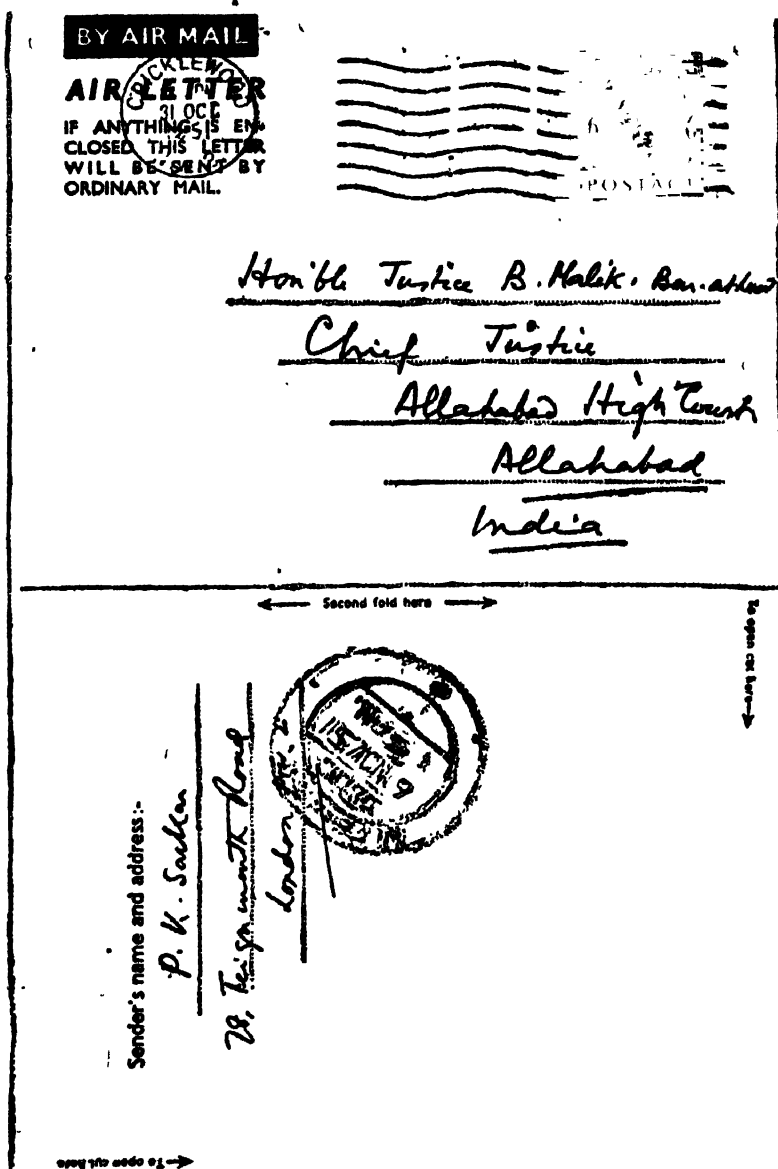
পরলোকগত আত্মাদের আহ্বান করা হইতেছিল। সহসা মিডিয়ম এলাহাবাদ হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিসের নাম উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার কোন আত্মীয় এই সভায় উপস্থিত আছেন কিনা

—কারণ চীফ জাষ্টিসের স্বর্গগতা পত্নী তাঁহার স্বামীকে জানাইতে চাহেন।
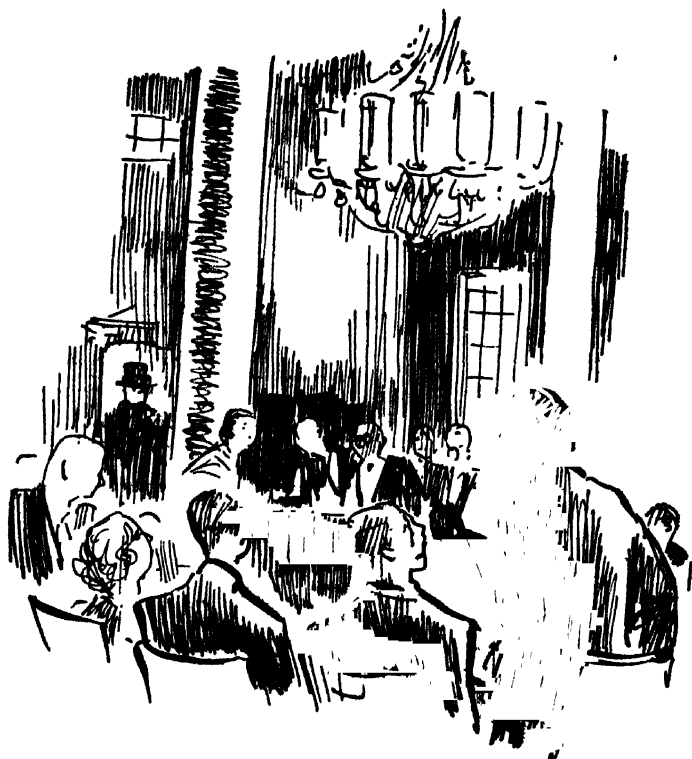
প্রফুল্লবাবু অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন যে তিনি চীফ জাষ্টিসের আত্মীয় এবং তাঁহার স্ত্রী কোন message দিলে তিনি তাহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন। মিডিয়ম প্রফুল্লবাবুকে তিনটি কথা মল্লিক মহাশয়কে জানাইতে বলিলেন···তাহার একটি হইতেছে যে, মল্লিক মহাশয় যেন তাঁহার পুরোন পরিচারিকাটিকে বরখাস্ত না করেন। প্রফুল্লবাবু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কোন্ পরিচারিকার কথা বলিতেছেন, তাহাতে মিডিয়ম উত্তর করেন যে, এই কথা বলিলেই তাঁহার স্বামী সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন। প্রফুল্লবাবু বিলাত হইতে শ্রীবিধুভূষণ মল্লিককে এই সম্বন্ধে যে পত্র লিখিলেন তাহা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম।

78, Teignmouth Road
Cricklewood
London N.W.2
31 10 51

My dear brother,

A few days ago I attended a seance held by a powerful London medium - Mr Joseph Benjamin. Leela Didimoni spoke to me through this medium. To prove her identity she told me that she had suffered long in the Earth plane before passing over. She asked me to convey her love to you. She has also asked me to tell you the following 3 things -

1) You must not over-exert yourself which you are apparently doing now.

2) You should take interest in psychic matters.

3) You should not dispense with the services of the old servant (possibly a maid servant or a woman assistant) which you are now contemplating. I wanted more details but was told that you would understand if I would write this much to you.

She is also anxious for the younger son's marriage which should be celebrated on his return from U.S.A.

I am leaving England by S.S. "Chusan" on the 2nd Nov. and shall reach Calcutta, Heaven willing, on the 18th of the month.

With my Bijoya regards.

Yours affly
Prafulla

(True Copy)

78, Teignmouth Road
Cricklewood.
London N. W. 2.
31.10.51.

My dear brother.

A few days ago I attended a seance held by a powerful London medium—Mr. Joseph Benjamin. Leela Didimoni spoke to me through this medium. To prove her identity she told me that she had suffered long in the earth plane before passing over. She asked me to convey her love to you. She has also asked me to tell you the following 3 things :—

1) You must not over-exert yourself which you are apparently doing now.

2) You should take interest in psychic matters and

3) You should not dispense with the services of the old servant (possibly a maid servant or a woman assistant) which you are now contemplating. I wanted more details but was told that you would understand if I would write this much to you.

She is also anxious for the younger son's marriage which should be celebrated on his return from U.S.A.

I am leaving England by S. S. "Chusan" on the 2nd November and shall reach Calcutta, Heaven willing, on the 18th of the month.

With my Bejoya regards.

Yours affectionately,
Profulla.

বাংলায় এই চিঠির অনুবাদ দিলাম।

৭৮, টাইনমাউথ রোড,
ক্রিকেলউড
লণ্ডন এন ডব্লিউ ২
৩১।১০।৫১

শ্রীচরণকমলেষু দাদা,

কয়েকদিন পূর্বে এখানে প্রেতাত্মা আনিবার এক বৈঠকে আমি যোগদান করিয়াছিলাম। লণ্ডনের ক্ষমতাশালী মিডিয়ম মিঃ জোসেফ বেঞ্জামিনের মাধ্যমে এই বৈঠক হয়। প্রেতাত্মা আনিবার এই বৈঠকে আমার সঙ্গে লীলা দিদিমণির কথাবার্তা হয়। তাঁহার পরিচয়ের প্রমাণ দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে বলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে ইহজগতে তাঁহাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। আপনাকে তাঁহার ভালবাসা তিনি আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন। নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ও আপনাকে জানাইবার জন্য তিনি আমাকে বলিয়াছেন।

বিষয় তিনটি হইতেছে :—

(১) আপনি বর্তমানে যেমন অতিরিক্ত কাজকর্ম করেন তদ্রূপ করিবেন না; (২) আপনি পারলৌকিক ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হইবেন; এবং (৩) বর্তমানে আপনি যে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, অর্থাৎ সেই পুরাতন ভৃত্যকে (সম্ভবত ঝি অথবা পরিচারিকা)

চাকরি হইতে বরখাস্ত করিবেন না। আমি তাঁহার নিকট এ বিষয়ে আরও বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে উত্তরে তিনি বলেন যে, এইটুকু আপনাকে লিখিলেই নাকি আপনি সমস্ত কিছুই বুঝিতে পারিবেন।

কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই তাহার বিবাহ দিতে হইবে।

আমি ২রা নভেম্বর তারিখে 'চুসান' জাহাজযোগে ইংলণ্ড হইতে রওনা হইব এবং ভগবানের ইচ্ছায় ১৮ই তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিব।

বিজয়ার শ্রদ্ধা জানিবেন,

ইতি আপনার স্নেহের

প্রফুল্ল

এই পত্র পাইয়াই বিধুবাবু পুরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, হরিদাসী তখনো জীবিত আছে। বলা বাহুল্য যে, মল্লিক মহাশয় তখন হইতে আবার তাহার পেন্‌সন্ পাঠানো শুরু করিলেন। শুধু তাহাই নয়, ইহার পূর্বে তাহার যত মাসের পেন্‌সন্ বন্ধ করিয়াছিলেন সে সমগ্র টাকা একসঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে হরিদাসীর মৃত্যু হয়।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বিধুবাবুর যেমন আত্মীয় তেমনি আমাদেরও একজন আত্মীয়। তাহাকে আমি বাল্যকাল হইতে জানি এবং ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলা করিয়াছি। প্রফুল্লকে প্রথম জানিয়াছিলাম পুরীতে, ১৯১১ সালে, যখন সে তাহার পিতামহের সহিত "হার্মিটেজ" নামক বাড়ীতে থাকিত, আর আমি আমার পূজনীয় কাকা মহাশয় স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষের সহিত "সুখসাগর" নামীয় বাড়ীতে থাকিতাম। প্রফুল্ল যে শুধু উচ্চ-শিক্ষিত এবং রেলওয়ে ফাইনান্‌সের উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাহাই নয়, সে হইতেছে যাহাকে আমরা বলি 'A man of character,' অর্থাৎ সে ধার্মিক ও সত্যবাদী। আমি তাহার সম্বন্ধে এত কথা লিখিলাম এইজন্য যে, প্রফুল্লের পত্র ফেলিয়া দিবার নহে।

প্রেতে ও মানুষে

সে আজ অনেক কালের কথা। তখন বাংলায় পল্লী অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং শহর অঞ্চলের এত উন্নতি হয়নি। তখন লোকের অভাব অভিযোগ কম ছিল কারণ জিনিসপত্র ছিল খুব সস্তা। তখন বাঙালী চাকরির জন্য পাগল হয়ে শহরে ছুটে আসত না। গ্রামের নদী, পুষ্করিণী ও শস্যক্ষেত্র গ্রামবাসীদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করত। গ্রামের জমিদার ও অবস্থাপন্ন লোকেরা তখন গ্রামেই থাকতেন। পরিবার সকল একান্নবর্তী ছিল এবং পুরুষেরা কেউ কেউ রোজগারের জন্য বিদেশে গেলেও বাকি সকলে গ্রামেই থাকতেন। সে সময় বাংলার জনসংখ্যা অনেক কম ছিল, সেই জন্য বহু জমি পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। গ্রামের আশ-পাশ নির্জন থাকাতে লোকের মন ডাকাত ও ভূত-প্রেতের ভয়ে আচ্ছন্ন ছিল। তখন গঙ্গা ময়রার মত ভূতের রোজারা বহু রোজগার করতেন। শিকড়-বাকড়ে লোকের বিশ্বাস ছিল; অবশ্য তাদের গুণও ছিল যথেষ্ট।

সেই কালে, আমাদের যশোর জেলার কোন এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বাস করতেন। গ্রামের নাম ছিল কল্যাণপুর আর দেবেনবাবু ছিলেন সেই গ্রামের জমিদার। তাঁর দু' মহলা চক-মিলান বাড়ী ছিল। বাহিরের মহলে ছিল জমিদারবাবুর বৈঠকখানা, নায়েব গোমস্তাদের দপ্তর এবং বাইরের কোন অতিথি এলে তাদের থাকবার ঘর। বাইরের মহলের পর উঠোন, তার পরেই অন্দর-বাড়ী। বাইরের উঠোনের রক থেকে অন্দরমহলে যাবার একটি গলিপথ ছিল। অর্থাৎ বাহিরের উঠোনের অন্দরের দিকের রক থেকে সেই গলিপথ দিয়ে অন্দরের উঠোনের রকে যাওয়া যেত। অন্দর-বাড়ীর মস্ত উঠোন। সেই দিকেই রান্না-বাড়ী, ভাঁড়ার-ঘর,

দাসীদের থাকবার ঘর ছিল। অন্দরের দোতলায় দেবেনবাবুর পরিবারবর্গ বাস করতেন।

কল্যাণপুরের দশ মাইল উত্তরে উষা গ্রামে দেবেনবাবুর জমিদারী ছিল। এই গ্রামে নায়েব তসিলদার ছিলেন রামচন্দ্র পাল। তাঁর একটি মাত্র ছেলে নরেন বা নরু। সে সেই বৎসর এনট্রান্স পরীক্ষা দেবে। টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে নরেন রামবাবুকে বললে, "বাবা আমাদের বাড়ীতে মোটে দুটি ঘর। আমার পড়াশুনোর বড় অসুবিধা হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার আগে এই দুটো মাস যদি আমি অন্য কোন স্থানে থেকে পড়তে পারতুম, তা'হলে আমি পাস সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারতুম।" রামবাবু কথাটা বুঝলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন উপায় স্থির করতে পারলেন না। উষা গ্রাম ছিল খুব ছোট। গ্রামটির তিন দিকে জঙ্গল ও একদিকে ছিল প্রকাণ্ড মাঠ। যদিও এই গ্রামে কয়েক ঘর মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাস ছিল, কাহারও এমন বড় বাড়ী ছিল না যেখানে একটি খালি ঘর পাওয়া যায়। এই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে জমিদার মশায়ের কথা রামবাবুর মনে পড়ল। দেবেনবাবু ছিলেন অত্যন্ত ভদ্রলোক ও দয়ালু। রামবাবু নিশ্চিত জানতেন যে তাঁর ছেলেকে দু' মাসের জন্যে স্থান দিতে জমিদারবাবু কখনও আপত্তি করবেন না। তিনি তাঁর ছেলে নরুকে বললেন, "বাবা, আমি তোমার থাকবার স্থান স্থির করেছি। আমি আজই কল্যাণপুরে গিয়ে বাবু মশাইকে অনুরোধ করব তিনি যেন তোমাকে পরীক্ষার দুটো মাস তাঁর বাড়ীতে রাখেন। কিন্তু বাবা, একটা কথা বলি। সেই বাড়ীতে বাবু মশাইয়ের পরিবারবর্গ বাস করেন। হয়ত তাঁরা তোমার সঙ্গে মেলা-মেশা করবেন। তুমি তাঁদের সঙ্গে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলবে। তোমার আঠার বছর বয়স হয়েছে তোমাকে বেশী কিছু বলা বাহুল্য। দেখো বাবা, কেউ যেন আমার নরুর নিন্দে না করে।" নরু বলল, "বাবা তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমাদের মনিব বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কিরূপভাবে ব্যবহার করতে হয় তা

আমি জানি। তা'ছাড়া আমি তো দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকব। তোমার ভয় নেই, কেউ তোমার ছেলের নিন্দে করবে না।"

রামবাবু যা ভেবেছিলেন, তাই হোল। জমিদারবাবু অতি আনন্দের সঙ্গে নরেনকে তাঁর বাড়ীতে রাখতে রাজি হলেন। নরেন যে ঘরটি পেলে তার দরজার সামনেই রক, তারপরেই উঠোন এবং উঠোনের অপর দিকে অন্দরমহলে যাবার রক, যেখান থেকে অন্দরের উঠোনে যাবার শুঁড়ি পথটি আরম্ভ হয়েছে। নরেন এই ঘরে থেকে পরীক্ষার। জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। সে অন্দরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করত এবং অতি শীঘ্রই জমিদার গৃহিণী ও তাঁহার কন্যাদের স্নেহ আকর্ষণ করে নিল। নরেন ছিল শান্তশিষ্ট ও বিনয়ী। সেই জন্যে সে সকলকার স্নেহ-ভালবাসা আকর্ষণ করতে পারত। জমিদার গৃহিণী ও কন্যারা নরেনের সঙ্গে আপনজনের মত ব্যবহার করতেন। এইভাবে নরেন কল্যাণপুরে জমিদার বাড়ীতে অধিষ্ঠিত হল। নরেন তার লেখাপড়ার একটি প্রণালী স্থির করে, দিন-রাতে ক'ঘণ্টা কি বিষয়ে পাঠ করবে তা' ঠিক করে নিল। রাতে খাওয়া দাওয়ার পরও সে ঘণ্টা দুই লেখাপড়া করত। রাত ঠিক বারটা বাজলে লেখাপড়া বন্ধ করে তার ঘরের বাইরে রকে এসে হাত মুখ ধুতো এবং ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ত।

এই ভাবে দিন যায়। একদিন রাত ঠিক বারটার সময় রকে বসে হাতে-মুখে জল দিয়ে নরেন যখন উঠে দাঁড়াল, উঠোনের অপর দিকে, অন্দরে যাবার রকের দিকে তার নজর পড়ল। নরেন দেখলে যে সেখানে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নরেন তাকে চিনতে পারলে না। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ল।

পরদিন রাত্রে নরেন পড়ছে আর ভাবছে কে সে মেয়েটি? অত রাত্রে রকে দাঁড়িয়ে কি করছিল? আজও সে আসবে না কি? নরেন পড়ে, আর মধ্যে মধ্যে মেয়েটির কথা ভাবে। এই দোনামনা

করতে করতে রাত বারটা বাজল। নরেন বাইরে হাত মুখ ধুতে গিয়ে প্রথমেই ওদিকের রকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। দেখলে, ঠিক সেইখানে সে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। নরেন লজ্জা পেল, কিন্তু অদম্য কৌতূহল বশতঃ মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটিও নরেনকে এক দৃষ্টে দেখছিল। ক্রমে মেয়েটি আস্তে আস্তে নরেনের দিকে এগুতে লাগল—যেন নরেনকে কি বলবে। ক্রমে মেয়েটি

উঠোনে নেবে ধীরে ধীরে নরেনের দিকে আসতে লাগল। কিন্তু নরেন আর অপেক্ষা করলে না। তার বুক ধড়ফড় করছিল। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

নরেনের সে রাত্তিরে ভাল ঘুম হল না। পরদিনও সারাদিন মনটা উচাটন হয়ে রইল। "কে এ মেয়েটি? কোথাও দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না। এত রাত্রে সে আমার ঘরের দিকে কেন আসছিল? গোড়ায় মনে করেছিলুম বাবুদের বাড়ীর কোন মেয়ে। কিন্তু তাও তো নয়? মেয়েটি কি ভাল মেয়ে নয়? অথচ মুখ দেখে তো সে রকম মনে হয় না। মুখে কেমন সরল ভাব, যেন আমাকে কি

বলতে চায়। দেখি, আজও যদি আসে তো তার পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।" নরেন সারাদিন এই সব কথা ভাবল, কিছুতেই মেয়েটিকে মন থেকে সরাতে পারলে না। সেদিন একটুও পড়াতে মন বসাতে পারলে না।

রাত বারটা। নরেন ঘরের বাইরে গিয়ে দেখলে যে, মেয়েটি আজ রক থেকে নেমে উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। নরেনকে দেখেই মেয়েটি তার কাছে অগ্রসর হয়ে এল। আজ আর নরেন তাকে ফেরাতে পারলে না। মেয়েটি নরেনকে অতি মিষ্টি স্বরে বললে, "তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে, তাই একটু গল্প ক'রতে এলুম। চল তোমার ঘরে গিয়ে বসি।"

মেয়েটির চোখে কি ছিল জানি না, নরেন যেন মন্ত্রমুগ্ধ কিংবা মোহগ্রস্তের মত হয়ে পড়ল। কেমন এক অবর্ণনীয় ভাব অনুভব করলে। সেটা আনন্দ, ভয়, মোহ না সুখ? নরেনের মন এবং দেহ দুই-ই যেন আর স্ববশে রইল না। সে মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে প্রবেশ করলে।

নরেন বললে, "তুমি কে?"

মেয়েটি বললে, "আমি মালতী। তুমি আমায় চেন না। আজ ক'দিন তোমায় দেখছি। তোমায় বড় ভাল লেগেছে, তাই তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এলুম। তুমি রাগ করনি ত?"

নরেন—"আচ্ছা, তুমি এত রাত্রে আস কেন?"

মেয়েটি—"ঠিক রাত বারটার সময় আমার আসবার সুযোগ হয়। অন্য সময়ে আমি চেষ্টা করলেও আসতে পারি না। এই সব জিনিস একদিন আমি তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলব। আমি রোজ ঠিক রাত বারটার সময় আসব ও দু'টোর সময় চলে যাব। তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না। আমার পরিচয় জানতে চেও না। আমি তোমার বন্ধু এই কি যথেষ্ট পরিচয় নয়?"

নরেনের তখন স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না। তা নইলে হয়ত সে মেয়েটির পুরো পরিচয় জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করত। কিন্তু সে তা করলে না। সে মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতে লাগল। তার মনে অনির্বচনীয় আনন্দ, যেন কেমন মোহগ্রস্ত ভাব। নরেনের একবারও মনে হ'ল না যে, এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। এক অপরিচিতা মেয়ে ঠিক রাত বারটার সময়ে আসে, এক মিনিট আগে কি পরে আসতে পারে না—এর মানে কি?—তার আত্মীয়-স্বজনই বা কোথায়?—এ সব কোন কথা নরেনের মনে উদয় হল না। সে কেবল তার সঙ্গে কথাবার্তার আনন্দে ডুবে রইল।

রাত দু'টো বাজতেই মেয়েটি উঠে বললে, "আজ যাই, কাল ঠিক বারটায় আসব।" বলে মেয়েটি ঘরের বাইরে চলে গেল। নরেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গিয়ে আর মেয়েটিকে দেখতে পেলে না। সারা উঠোন খাঁ খাঁ করছে আর রকে কোন জন মনিষ্যি নেই।

পরদিন আবার ঠিক রাত বারটার সময় মালতীর আগমন হল, পড়া সেরে ঘরের বাইরে যেতেই দরজার কাছে মালতীকে সে দেখতে পেলে। তার পরে তারা দু'জনে ঘরের ভিতরে এসে গল্প গুজব আরম্ভ করলে।

এইরূপে দিন কাটছে, নরেনের লেখাপড়া চুলোয় গেছে। নরেন সর্বক্ষণ মেয়েটির কথা ভাবে,—এমনই তার আকর্ষণ। সে সারাদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে—কখন রাত বারটা বাজবে। মেয়েটির সঙ্গ উন্মাদকর এবং রাত বারটা থেকে দু'টো পর্যন্ত এই দু' ঘণ্টা সুখ-স্বপ্নের মত কেটে যায়। কখনো কখনো নরেন ভাবে যে, কে এই মেয়েটি, কোথায় থাকে, কার মেয়ে, কেন সে রাত্রি বারটার সময় আসে, কেন দু'টোর পরেই চলে যায়—কিছুই বুঝতে পারে না। তাকে জিজ্ঞাসা করলে মালতী কেবল হাসে, বলে, "আমার পরিচয় নিয়ে কি হবে? কেন, আমাকে কি পছন্দ কর না? তুমি প্রায়ই জিজ্ঞাসা কর—কেনই বা আমি বারটার সময় আসি ও দু'টার সময় চলে

যাই। তার কারণটা আজ আমি তোমায় বলি। রাত বারটা থেকে দু'টো পর্যন্ত যে ক্ষণ, কেবল সেই সময়টাই আমি তোমার কাছে আসতে পারি। আমার এমন ক্ষমতা নেই যে, বারটার আগে আসি কিংবা দু'টোর পরেও থাকি।"

নরেন এই সব কথা শোনে আর তার মনে কেমন একটা সন্দেহের উদয় হয়। এক একবার একথাও তার মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারে যে, এ কি মানুষ নয়? আরও একটা জিনিস সে লক্ষ্য করলে যে, মালতী চলে যাওয়ার পর তার দেহমনে একটি গভীর অবসাদ আসে। সে মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়ে ও পরদিন উঠতে অনেক বেলা হয়ে যায়। সে আরও লক্ষ্য করলে যে তার শরীর দিনের পর দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে একথা তার মনে বদ্ধমূল হল যে, মালতীর সঙ্গ তার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। কিন্তু কি করা যায়? কি করে এর হাত থেকে উদ্ধার পাব? নরেন বেশ বুঝতে পেরেছে যে তার পাস হওয়া অসম্ভব এবং এভাবে আর দিন কতক চললে তার শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে। নরেন উপায় ঠাওরাতে লাগল যে কি করে মালতীর আসা বন্ধ করা যায়। সে ভাবলে যে, "মালতী যখন বলেছে যে রাত বারটা থেকে দু'টো পর্যন্ত তার আসবার সময়, আমি কেন সেই সময়টা দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতর শুয়ে থাকি না? সে দরজা বন্ধ দেখে বুঝতে পারবে যে আমি হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছি।" নরেন প্রতিজ্ঞা করলে যে সেই রাত্রেই সে ঐরূপ করবে।

সেইদিন রাত্রে রাত এগারোটার সময় নরেন দরজা বন্ধ করে তার বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে ঘুমোবার চেষ্টা করলে কিন্তু ঘুম কিছুতেই এল না। যখন জমিদার বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে তখন ঘরের মধ্যে খস্ খস্ করে কেমন একটা শব্দ হল। নরেন এতক্ষণ চোখ বুজে পড়েছিল। খস্ খস্ শব্দ শুনে নরেন চোখ মেলে দেখলে যে, মালতী ঘরের ভিতর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও এই ব্যাপারে নরেন হতভম্ব হয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্যের কথা

এই যে, সে মালতীকে দেখে আবার মোহাবিষ্ট হ'ল এবং তাড়াতাড়ি উঠে বসে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালে। মালতী হাসিমুখে বললে, "আজ যে বড় দরজা বন্ধ করে রেখেছ? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?"

নরেন বললে, "না না, শরীরটা খারাপ বোধ হওয়াতে বিছানায় শুয়েছিলুম, মতলব ছিল বারোটা বাজলেই বাইরে যাব। কিন্তু তুমি ঘরের ভেতরে এলে কি করে?" মালতী হাসতে হাসতে বললে, "আমি এক ম্যাজিক জানি, দরজা বন্ধ থাকলেও কি করে ঘরের ভেতর আসতে পারা যায়, সেকথা তোমাকে একদিন আমি বুঝিয়ে দেবো।"

সে রাত্রে মালতী চলে গেলে নরেন এক লহমাও ঘুমোতে পারলে না। সে কেবলই ভাবে যে মালতী কি করে ঘরের দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ভিতরে আসতে পারলে! যেটা এতদিন তার মনে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল এখন সেই ধারণা তার বদ্ধমূল হল। মালতী যে মানুষ নয়, কোন মৃত স্ত্রীলোক এই ধারণা তার মনের উপর চেপে বসল। কিন্তু আত্মা ত অশরীরী, সে দেহ ধারণ করে কি করে! ক্রমে

নরেনের মনে পড়ল যে মালতী বার বার বলেছে যে, কেবল রাত বারোটা থেকে দু'টো পর্যন্ত সে নরেনের কাছে আসতে পারে। নরেন ভাবলে, হয়ত কেবল এই সময়টুকুর জন্যই সে স্থূল দেহ ধারণ করতে পারে। নরেনের এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না এবং কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারলে না। তবে এটা সে স্থির বুঝলে যে এইভাবে আর কিছুদিন চললে—পাস করা দূরে থাকুক—তার প্রাণ সংশয় হবে।

এর দু'চার দিনের ভিতরই নরেন কঙ্কালসার হ'য়ে পড়ল। ভয় ও প্রেতসঙ্গ তার শরীর আর মনকে দগ্ধ ক'রে দিলে। দিন-রাত তার খাওয়া নেই, ঘুম নেই—কেবল রাত্রে ঐ দু'ঘণ্টা সে ভুলে থাকে, এমনি মালতীর আকর্ষণ আর এমনি নরেনের মোহ।

বাড়ীর সকলে দেখলে যে, নরেন শুকিয়ে যাচ্ছে। একদিন গৃহিণী অনুযোগ করলেন যে, সে যেন রাত জেগে বেশী পড়াশুনা না করে। তার পুষ্টিকর খাবারেরও বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। তখন গৃহিণী একদিন জমিদার বাবুকে নরেনের শারীরিক অবস্থার কথা জানালেন।

দেবেনবাবু নরেনকে ডেকে পাঠালেন ও তাকে বহু প্রশ্ন করলেন। নরেন প্রথমটা লুকোতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে শেষটা নরেন সেই মেয়েটির কথা ব'লে ফেললে। একটি ভদ্রলোকের মেয়ে রাত্রে তার ঘরে আসে শুনে জমিদারবাবু চমকে উঠলেন ও বার বার সে মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। নরেন বললে, "আমি অনেক জিজ্ঞাসা করেছি, সে কোন পরিচয় দেয় না।"

জমিদার—তুমি তাকে ঘরে ডেকে আন কেন?

নরেন—আমি ডাকি না, সে আপনি আসে।

জমিদার—তুমি দরজা বন্ধ করে থাক না কেন? তুমি ত বলছ যে, সে রাত বারোটার আগে আসতে পারে না। তুমি তার আগেই দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড় না কেন?

নরেন—আমি দরজা বন্ধ ক'রে দেখেছি। দরজা বন্ধ থাকলেও সে ঘরে আসে।

জমিদারবাবু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, "তুমি কি গাঁজাখুরি কথা বলছ? দরজা বন্ধ থাকলে সে আসবে কেমন করে?"

নরেন—তা জানি না। বোধ হয় তার কোন অমানুষিক ক্ষমতা আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। সে খালি হাসে আর বলে, 'একদিন বুঝতে পারবে'।

নরেনের কথা শুনে দেবেনবাবু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন না এর রহস্যটা কি। তিনি নরেনকে ভালভাবে জানতেন যে সে সত্যবাদী ও সৎ। বিশেষতঃ তাঁর সামনে সে কখনই মিথ্যাকথা বলবে না। তিনি নরেনকে বললেন, "তুমি আমাকে এই ব্যাপারটা দেখাতে পার?"

নরেন—নিশ্চয় পারি। আপনি রাত বারোটার কিছু আগে থাকতে আমার পাশের ঘরটায় লুকিয়ে থাকবেন, তাহলে সবই দেখতে শুনতে পাবেন।

দেবেনবাবু তখনই নরেনের ঘরে গেলেন ও দরজা, জানলা সব তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা ক'রে বুঝলেন যে, দরজা বন্ধ থাকলে বাইরে থেকে সে ঘরে আসা একেবারে অসম্ভব। এই ঘরের পাশেই একটি ছোট ঘর ছিল এবং এই দুই ঘরের মধ্যে একটি ছোট জানলা ছিল। দেবেনবাবু ভেবে দেখলেন যে, ঐ জানলাটা খুলে যদি কেউ আলো নিবিয়ে ঐ ছোট ঘরটায় লুকিয়ে থাকে—তা'হলে নরেনের ঘরের সব ব্যাপারই সে লক্ষ্য করতে পারবে। দেবেনবাবু মনে মনে এই প্ল্যান স্থির ক'রে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করলেন।

রাত বারোটার কিছু আগে দেবেনবাবু সেই ছোট ঘরটায় গিয়ে ছোট জানলাটার আড়ালে লুকিয়ে রইলেন, কিন্তু নরেনের ঘরের ভিতর খর দৃষ্টি রাখলেন। নরেন দরজা বন্ধ ক'রে শুলে তিনি

দরজাটির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন যাতে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে মেয়েটি ঘরের ভিতর না আসতে পারে।

দেবেনবাবু এইভাবে চেয়ে আছেন আর নরেনের ঘরে আলো জ্বলছে। ঠিক বারোটার সময় তাঁর চোখে কেমন ধাঁধা লাগল। তিনি মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলেন। তখনই চোখ চেয়ে দেখলেন যে একটি সুন্দরী মেয়ে নরেনের ঘরের ভিতর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কিসে কি হ'ল তিনি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তারপর মালতী ও নরেন যখন কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলে দেবেনবাবু চুপিসাড়ে সে ঘর থেকে চ'লে গেলেন। মালতী যে প্রেতিনী সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন প্রত্যূষেই দেবেনবাবু নরেনের বাবাকে এক জরুরী পত্র লিখে ঘোড়সোয়ার দিয়ে উষা গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখলেন, "তুমি এখনই এসে নরুকে তোমার গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, নইলে তার প্রাণ সংশয়।" আর নরেনকেও ডেকে বললেন যে, তার বাপকে আনতে লোক গিয়াছে। তিনি এলেই যেন তাঁর সঙ্গে নরেন গ্রামে ফিরে যায়। নরেন খুব রাজী, কারণ রাত্রের ঐ দু'ঘণ্টা ছাড়া নরেন স্ববশে সাধারণ মানুষের মতই থাকত। সে বুঝলে এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে তার পালানই মঙ্গল।

সেই দিনই নরেনের বাবা এলেন। নরেনের শরীরের অবস্থা দেখে এবং সব কথা শুনে ভয়ে দুঃখে তিনি পাগলের মত হ'য়ে পড়লেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে জমিদারবাবুকে বললেন যে, তিনি সেই দিনই নরুকে নিয়ে যাচ্ছেন। দেবেনবাবু বললেন, "শুধু নিয়ে গেলে হবে না। একজন ভাল রোজাকে দিয়ে নরুকে দেখাও। ওকে পেতনীটা যেভাবে পেয়েছে তাতে ছাড়ান সহজ নয়।" রামবাবু বললেন যে, তিনি তাই করবেন। সেই দিনই তাঁরা উষা গ্রামে ফিরে গেলেন।

নরেনের মা সব কথা শুনে কেঁদে সারা। তিনি বললেন, পরীক্ষা মাথায় থাকুক, ছেলের প্রাণ বাঁচান আগে দরকার।" নরেনও এত

দূর চলে এসে আর বাবা মাকে নিকটে পেয়ে মনে অনেকটা বল পেলে। সে ভাবলে পেতনীটাকে আর এত দূর আসতে হবে না। সে সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে তার ঘরে শুতে গেল।

কিন্তু ঘুম আর আসে না। ক্রমেই রাত হচ্ছে আর নরেন ভাবছে সে কি এখানেও আসবে নাকি! এই ভাবে রাত বারোটা বাজল আর সঙ্গে সঙ্গে নরেন দেখলে যে, মালতী ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। নরেন ভয় পেলে, কিন্তু সেই অদম্য মোহ। সে উঠে মালতীকে সম্ভাষণ করলে।

মালতী—তুমি যে এখানে চ'লে এলে? তুমি কি ভাবছ?

নরেন—আমি ভাব্‌ছি তুমি কি ক'রে এখানে এলে? আমার শরীর খারাপ হয়েছে ব'লে বাবা আমাকে নিয়ে এসেছেন।

মালতী—তুমি সত্যি বলছ? তোমাকে আমার কাছ থেকে ছাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে না ত? সে কিন্তু কেউ পারবে না, তা যত চেষ্টাই না কর। তুমি কি এতদিনেও বুঝতে পারনি যে আমি কে? তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি কখনও তোমার অনিষ্ট করব না। কিন্তু তুমি যেখানে যাবে আমিও যাব। তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে এই ভাবে আমি আসব। তোমার মৃত্যুর পর আমরা চিরকাল একসঙ্গে থাকব।

মালতীর কথা শুনে নরেনের বুক কেঁপে উঠল যদিও সে আগেই বুঝেছিল যে মালতী মানুষ নয়, কিন্তু এমন খোলাখুলিভাবে সেকথা এর আগে কোনদিন হয়নি। যখন মালতী বললে যে "কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে ছাড়াতে পারবে না।" তখন ভয়ে নরেনের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে এল। সে যদিও অন্যদিনের মত হাসিখুসির ভান করলে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তার মুখ শুকিয়ে উঠতে লাগল।

দু'টোর সময় মালতী চ'লে গেলেই নরেন পাগলের মত ছুটে গিয়ে তার বাবা-মার শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। তাঁরা

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সব কথা শুনলেন ও হাহাকার ক'রে কাঁদতে লাগলেন। সে রাত্রে আর কেউ ঘুমোতে গেলেন না।

পরদিন সকালেই রামবাবু প্রতিবেশীদের ডেকে এনে সব কথা বললেন। তাঁরা বললেন, যতশীঘ্র পারা যায় একজন ভাল রোজাকে ডাকান হোক। আর যতদিন না রোজা আসে ততদিন নরু তার বাবা-মার মধ্যিখানে শোবে। একজন এ সংবাদ দিলেন যে, সাত ক্রোশ দূরে একজন সত্যিকার ভাল রোজা থাকে। তার ভূতপ্রেত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, আর সে অনেক দরকারী শিকড়-বাকড়েরও সন্ধান রাখে। সেইদিনই সেই রোজাকে আনতে লোক পাঠানো হল, আর তাকে বলে দেওয়া হল যাতে তার পরদিনই সে রোজাকে নিয়ে আসে। রোজা যা চাইবে তাই তাকে দেওয়া হবে —একথাও তাকে বলে দেওয়া হল।

সেদিন রাত্রে নরেন বাবা-মার সঙ্গে একঘরে শুল। দু'পাশে বাবা-মা, আর নরেন শুয়েছে মধ্যে, একই বিছানায়। তিন জনই জেগে আছেন, আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় কেউই ঘুমোতে পারছেন না। এইভাবে রাত বারোটা বাজল।

নরেন চোখ বুজে শুয়েছিল। হঠাৎ নরেন অনুভব করলে কে যেন তাকে ঠেলছে। নরেন চমকে চোখ মেলে দেখলে যে মালতী মাথার কাছে বসে আছে! নরেন চুপি চুপি বললে, "তুমি কি করছ, বাবা-মা জানতে পারবেন যে।" মালতী স্বভাবিক সুরে বললে, "তোমার সে ভয় নেই, ওঁরা কিছু জানতে পারবেন না।" নরেন উঠে দেখলে যে তার বাবা-মা মড়ার মত পড়ে আছেন। তারা তখন পাশের ঘরে গেল। একথা বলাই বাহুল্য যে, মালতীই রামবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে অজ্ঞান করে রেখেছিল।

পরদিন সব কথা শুনে নরেনের বাবা-মা পাগলের মত বুক চাপড়াতে লাগলেন। নরেনও বুঝলে যে আর তার নিস্তার নেই। আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় তার শরীরের আর কিছু নেই। দেহ কঙ্কাল-

সার, সব সময় বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে। বহুকষ্টে হাঁটে, এমন কি বসে থাকতেও কষ্ট হয়, সব সময় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সে ভাবছে এ অবস্থার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। গ্রামের লোকেরাও দুঃখিত। সকলের শেষ আশা সেই রোজা। যদি সে কিছু করতে পারে।

সেদিন বিকেলে রোজার আগমন হল। সে ধীরভাবে আগাগোড়া সব কথা শুনলে আর নরেনের শরীরের অবস্থাও দেখলে। রোজা বললে যে সে একবার সমস্ত ব্যাপারটা নির্জনে ভেবে দেখবে যে এর কোন উপায় আছে কি না। সে স্পষ্টই বললে যে মেয়েটা যেভাবে নরেনকে গ্রাস করে বসে আছে তাতে তাকে ছাড়ান খুব শক্ত। এই বলে রোজা এক নির্জন গাছতলায় গিয়ে বসল। ঘণ্টা দুই বাদে রোজা ফিরে এসে বললে যে সে একটা উপায় বার করেছে, সেটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক উপায়। সে রামবাবুকে তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং

প্রবীণ প্রতিবেশীদের ডেকে আনতে বললে। রোজা তাঁদের সামনে তার কথা বলবে এবং যদি সকলের মত হয় তা'হলে সে নরেনের ব্যাপারের ভার নেবে। রোজার কথামত তখনই আত্মীয়স্বজনদের এবং প্রতিবেশীদের ডাকা হল। তাঁরা সকলেই রামবাবুর হিতৈষী এবং নরুর মিষ্ট স্বভাবের জন্য তাকে ভালবাসেন। তাঁরা সকলেই রোজাকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন যে, যে উপায়েই হোক নরুকে যেন এই ভীষণ বিপদ থেকে রক্ষা করা হয়। রোজা তাঁদের বললে, "আপনারা নরেনবাবুর অবস্থা তো দেখছেন। এইভাবে চললে একমাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত। কেবল একটি মাত্র উপায় আছে যাতে এঁকে বাঁচান যায়, কিন্তু সেই উপায়ের আর একটি দিক আছে—সেটাও আপনারা ভেবে দেখুন। আমার মতলব যদি সফল হয় তাহলে চিরকালের জন্য নরেনবাবু প্রেতিনীর হাত থেকে উদ্ধার পাবেন। কিন্তু যদি অকৃতকার্য হন তা'হলে এখনি ওঁর প্রাণ যাবে। এখন আপনাদের ভেবে দেখতে হবে যে আপনারা একমাসের মধ্যে নরেনবাবুর নিশ্চিত মৃত্যু চান অথবা তাঁকে চিরতরে বিপদমুক্ত করতে চান, যদিও এতে আজই ওঁর প্রাণ যেতে পারে। আপনারা বেশ করে ভেবে জবাব দিন।" রামবাবুর স্ত্রী দরজার আড়ালে বসে সব শুনছিলেন, তিনি কেঁদে উঠলেন ও অস্ফুটস্বরে বললেন, "বাপ রে, যাতে আজই আমার ছেলের প্রাণ যেতে পারে তাতে আমি কখনই মত দেব না।" রামবাবুও দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছেন, কিন্তু তিনি পুরুষ মানুষ, তিনি রোজার কথাটি ভাল করে বিবেচনা করে দেখতে লাগলেন। একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী রোজাকে অনুরোধ করলেন, সে যাতে তার সমস্ত মতলবটা ভেঙ্গে বলে। রোজা বললে, "আমি বলব না, আমি কাউকে কিছু জানতে দেব না, আমি শুধু নরেনবাবুকে যা যা করতে হবে বুঝিয়ে দেব, তবে এ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক ব্যাপারও কিছু আছে তা কিন্তু আপনাদের করে দিতে হবে।"

এরূপ জীবন-মরণের কথায় বাপ-মার মতি স্থির করা খুব শক্ত, তাঁরা একবার এদিক ভাবেন একবার ওদিক ভাবেন। প্রতিবেশীরা তখন তাঁদের বোঝাতে লাগলেন। "তোমরা কি চাও না যে নরেন সুস্থশরীরে সুস্থমনে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে? দিনকতকের মধ্যে ওর প্রাণ তো যাবেই, এরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় দিনকতক বেশী বেঁচে থেকে লাভ কি? আমাদের মত হচ্ছে রোজার কথামত চলা। যখন আর কোন উপায় নেই তখন এই উপায়ই নিতে হবে।" যদিও কথাটা তাঁরা বুঝলেন তবুও মা-বাপের মন, রামবাবু ও তাঁর স্ত্রী দোনামোনা করতে লাগলেন। যে কাজে আজই ছেলের মৃত্যু হতে পারে কেমন করে তাঁরা তাতে মত দেন? কিন্তু নরেনই এ সমস্যার সমাধান করে দিলে, নরেন বললে, যে তার বর্তমান অবস্থায় সে একদিনও বেঁচে থাকতে চায় না। সে রোজাকে পরিষ্কার বললে, "আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন ভাল নয়তো আজই আমার জীবন শেষ করে দিন, আমি এ নরক যন্ত্রণা আর একটা দিনও সহ্য করতে পাচ্ছি না।" নরেনের বাবা-মা কাঁদতে লাগলেন আর আত্মীয়স্বজনরা বোঝাতে লাগলেন। শেষে, সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল যে, রোজার উপরে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হোক। রোজা বললে, "আজ সন্ধ্যে হয়ে গেছে আজ আর কিছু হবে না, আর একটা রাত্রি নরেনবাবু এইভাবেই থাকুন, কাল আমি এ ব্যাপারের হেস্তনেস্ত করব। তবে এখানে হবে না। যেখানে নরেনবাবুর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল সেখানে যেতে হবে।" শেষকালে স্থির হল যে, রোজা ও নরেন রামবাবুর সঙ্গে পরদিন সকালে কল্যাণপুরে জমিদার বাড়ীতে যাবে।

সে রাত্রে মালতী নরেনকে বললে, "তোমায় আগেও বলেছি এখনও বলছি যে কেউ তোমাকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না, আমি কখনও তোমার কোন অনিষ্ট করব না, তুমি আগে যেখানে ছিলে সেখানে ফিরে যাও, আমার এখানে আসতে কিছু কষ্ট

হয়।" নরেন তাকে বললে, "তাই হবে। কালই আমি কল্যাণপুরে ফিরে যাব।"

পরদিন কল্যাণপুরের জমিদার বাড়ীতে রামবাবু, নরেন ও রোজা উপস্থিত হল। রোজা দেবেনবাবুকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিলে এবং বললে, "আপনাকে কিছু সাহায্য করতে হবে।" দেবেনবাবু খুব আগ্রহের সঙ্গে সব কথা শুনলেন আর বললেন, "তুমি যা চাও করব। নরু আমার ছেলের বাড়া। তা'ছাড়া মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও এই পৈশাচিক ব্যাপারের যাতে অবসান হয় তাতে আমি সর্বপ্রকার সাহায্য করতে বাধ্য।"

রোজা—আপনাকে বেশী কিছু করতে হবে না, আপনি শুধু নরেনের ঘরটি খুব ভাল করে সাজিয়ে দিন। ঘরটি ঝেড়ে মুছে তক্তপোশ সরিয়ে সেখানে একটি খাট পেতে দিন। আর ঘরটি আর বিছানাটি নানা রকম ফুল ও মালায় সজ্জিত করুন, সব বন্দোবস্ত সন্ধ্যের মধ্যে শেষ করতে হবে।

জমিদার—এতে আর কষ্টটা কি, সন্ধ্যের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

রাত দশটার সময় রোজা নরেনকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। সেখানে রোজা নরেনকে তার মতলবটা ভেঙ্গে বললে আর খুব ভাল করে নরেনকে বুঝিয়ে দিলে, তাকে কি করতে হবে আর কি বলতে হবে। শেষকালে রোজা বললে, "আপনার জীবন এখন আপনার হাতে, ভূতনাথ মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি আপনার বুকে বল দিন।"

রাত্রি বারটার কিছু আগে রোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঠিক রাত বারটায় মালতীর আগমন হল, নরেন খুব আগ্রহের সঙ্গে তাকে আহ্বান করলে এবং সাজান খাটে বসতে বললে।

মালতী—আজ একি ব্যাপার? এমন খাট এত ফুলের মালা এ কার জন্যে?

নরেন—কেন তোমার জন্যে আর তার পুরস্কারও তো পেলুম।

মালতী—কি পুরস্কার পেলে ?

নরেন—কেন কখনও যা করনি তা আজ করেছ। এর আগে তো কখনও তুমি দু'বার আসনি।

মালতী—দু'বার মানে কি ? আমি আবার কখন এলুম ?

নরেন—তুমি এর মধ্যে ভুলে গেলে ? তুমি রাত সাড়ে দশটার সময় এলে আর বললে যে, তুমি ফুল দিয়ে সাজান ঘর দেখে আজ আগেই এসেছ, আমার সঙ্গে ফুল নিয়ে মালা নিয়ে কত কাড়াকাড়ি করলে, এই দেখ বিছানাতে ছেঁড়া মালা ছেঁড়া ফুল পড়ে রয়েছে। এইতো মাত্র পনেরো মিনিট হল তুমি গিয়েছ এর মধ্যে সব ভুলে গেলে, না আমার সঙ্গে তামাসা করছ ?" নরেনের কথা শুনতে শুনতে মালতীর হাসি মিলিয়ে গেল, মুখ হল অসম্ভব গম্ভীর আর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোতে লাগল।

মালতী—তুমি তো আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছ না ? তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল যে আমি আজ রাত্রে আবার এসেছিলুম ?

নরেন তখনই তাই করলে। মালতী আর কোন কথা না বলে এক মনে ভাবতে লাগল। মালতীর মুখের সৌন্দর্য গেছে মিলিয়ে, মুখ রাগে কালো হয়ে গেছে আর থমথম করছে। কিছুক্ষণ পরে মালতী নরেনকে বললে যে এর আগে সে আসেনি আর কেউ তার মত সেজে এসেছিল। নরেন যেন কত দুঃখ আর ভয় পেয়েছে এইভাবে বললে, "যদি তাই হয়ে থাকে তবে তুমি তার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও, আমার তোমাকেই ভাল লাগে আর তোমারই বন্ধুত্ব কামনা করি। যদি আর কেউ এভাবে আসে তাহলে আমি আর বাঁচব না, যে করে হোক তুমি আমাকে এই ঘোর বিপদ থেকে বাঁচাও।" মালতী কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে বললে যে, "এর এক উপায় আছে কিন্তু তা কি তুমি পারবে ? আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে কি ? আমি কে তাত জান, এই গভীর রাত্রে আমার সঙ্গে

তুমি এক জায়গায় যেতে পার?" নরেন বুঝলে যে এতক্ষণে তার জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে, তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল এবং বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগলো। সে কষ্টে হেসে বললে, "তোমার সঙ্গে যাব তাতে ভয়টা কি? কিন্তু তুমি কি করতে চাও আমাকে বুঝিয়ে বল।"

মালতী—এখান থেকে দু' মাইল দূরে উত্তর দিকে যে জঙ্গলটি আছে সেখানে তোমায় নিয়ে যাব। সেখানে এক জায়গায় এক রকমের লতা আছে সেই লতার শিকড় তোমাকে আনতে হবে।

নরেন—তা তুমি কেন নিজেই নিয়ে এস না, তুমি তো সব জায়গায় যেতে পার, বাইরে কী ভীষণ মেঘ করেছে দেখ, তুমি তো জান, আমার হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়।

মালতী—আমি যদি আনতে পারতুম তাহলে কি তোমাকে কষ্ট দি। আমি সে লতা গাছের কাছেও যেতে পারি না। তোমাকেই সে শিকড় আনতে হবে। সেই শিকড় দিনরাত তোমার হাতে বেঁধে

রাখতে হবে। ঠিক রাত বারটার সময় সেই শিকড় খুলে অন্য ঘরে তফাত করে রেখে আসবে, আর রাত দু'টোর সময় আমি চলে গেলে আবার পরে থাকবে, তাহলে কেউ আর তোমার কাছে আসতে পারবে না।

নরেন আর কিছু বললে না এবং তারা দু'জন ঘর থেকে উঠোনে নামল, ক্রমে উঠোনের বাইরে এসে গ্রামের উত্তর দিকে যেতে লাগল। আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, পল্লী পথ জনহীন, নরেনের সঙ্গী কেবল মালতী। সে মানুষ নয়, নরেন জানে।

শুধু তাই নয় নরেন দুর্বল বলে মালতী তার হাত ধরে আছে। মালতী তাকে বললে, "এখন তুমি বেশী পরিশ্রম করো না, তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল, মনে রেখ আসবার সময় আমি তোমার কাছে থাকতে পারব না, তোমাকে নিজেই আসতে হবে।"

এইভাবে তারা দুজনে যাচ্ছে, গ্রাম্য পথ ছেড়ে তারা ধান ক্ষেতের দিকে গেল এবং সরু আলের উপর দিয়ে যেতে লাগল, গভীর অন্ধকারে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আলোতে নরেন পথ দেখতে পাচ্ছে, অন্য সময়ে সম্পূর্ণ মালতীর উপর নির্ভর। ক্রমে তারা নদীর ধারে পৌঁছলো, সামনেই শ্মশান, যার নাম কালাপেড়ের দেয়াড়। কটি তেঁতুল গাছ দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে, কি নির্জন স্থান, নরেনের বুক সবলে স্পন্দিত হতে লাগল, কিন্তু রোজার কথা তখন তার কানে বাজছে, "নরেনবাবু আপনার জীবন আপনার হাতে, ভূতনাথকে স্মরণ করবেন কোন ভয় নেই।"

এইবার জঙ্গল আরম্ভ হল, এখন আর পথ নেই, প্রেতিনী যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে মানুষ সেদিকে যাচ্ছে। একটু পরে ডানদিকে একটি বড় অশ্বত্থ গাছ দেখা গেল। মালতী নরেনকে ছেড়ে দিয়ে বললে, "ঐ গাছটার ওপারে আগাছার জঙ্গল আছে। সেখানে গোটাকতক লতানে গাছ আছে, তারই একটা শিকড়সুদ্ধ তুলে নিয়ে এস, তোমাকে একলাই যেতে হবে।" প্রেতিনীর নির্দেশমত নরেন অগ্রসর হয়ে গেল এবং সেখানে কয়েকটি লতানে গাছ দেখতে পেলে। মূলসুদ্ধ একটি লতানে গাছ তুলে এনে নরেন পূর্বস্থানে ফিরে এল কিন্তু মালতীকে সে স্থানে দেখতে পেলে না। সে ভয়কম্পিত স্বরে ডাকলে, "মালতী···।" প্রায় পঞ্চাশ হাত দূর থেকে মালতী জবাব দিলে "আমি এখানে আছি। এখন তো মেঘ খানিকটা কেটে গ্যাছে এবং অল্প চাঁদের আলো ফুটেছে আমার সাদা কাপড় তো তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি এগিয়ে যাচ্ছি তুমি পেছনে পেছনে এস।"

নরেন দ্রুতপদে মালতীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, "আগে তুমি শিকড়টি দেখ তো যে ঠিক জিনিসটি এনেছি কিনা।" মালতী সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক জিনিসই এনেছ, তুমি আমার অত কাছে এস না।" মালতী এগিয়ে যাচ্ছে আর পঞ্চাশ হাত পিছু পিছু নরেন আসছে। আবার সেই নদীর ধার—সেই

কালাপেড়ের দেয়াড়। সেই ধান ক্ষেত, আর সরু আলের রাস্তা। আবছা আলোতে নরেন মালতীকে দেখতে পাচ্ছে। ক্রমে গ্রাম্য পথে এসে পৌঁছলো এবং অবশেষে বাড়ী। মালতী চেঁচিয়ে বললে "তুমি শিকড়টা অন্য ঘরে রেখে এস এখনও ছ'টা বাজতে আধ ঘণ্টা দেরী আছে।" নরেনের রোজার কথা মনে হল। পরিত্রাণের উপায় পেলে তা এক মুহূর্তের জন্য ত্যাগ করবে না, তাই নরেন মালতীকে বললে, "আজ আমি বড় ক্লান্ত আজ তুমি যাও কাল তুমি এস।" মালতী বললে, "বেশ তাই হোক্ এখনই শিকড়টি হাতে বেঁধে ফেল, কাল রাত বারোটার সময় আবার খুলে রেখ।"

নরেন বাড়ীতে পৌঁছেই জমিদারবাবুর বৈঠকখানা ঘরে গেল। সেখানে রোজা, দেবেনবাবু ও তার বাবা গভীর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলেন। নরেনকে দেখতে পেয়ে তাঁরা আনন্দে কলরব করে উঠলেন। রোজা জিজ্ঞাসা করলে "ওষুধ পেয়েছেন? কি জিনিস পেলেন দেখি?" নরেন শিকড়সুদ্ধ লতাটি রোজাকে দিলে আর মালতী তাকে যা যা বলে দিয়েছিল তাও বললে। রোজা বললে "আর ভয় নেই, জয় ভগবান।" সেই রাত্রেই এক বালার ভিতরে সেই শিকড় রেখে নরেনের বাহুতে মোক্ষম করে বেঁধে দেওয়া হল। সে এমন বজ্র বাঁধন যে নরেন নিজে হাজার চেষ্টা করলেও অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সে বালা খুলতে পারবে না। এ বালা রোজাই সঙ্গে এনেছিল এবং এর গঠনও একটু বিশেষ রকমের। নরেনকে বালা পরিয়ে দিয়ে রোজা বললে, "এখন দিনকতক রাত্রে ও রোজ আসবে এবং অনুনয় বিনয়, এমন কি ভয় প্রদর্শনও করবে। কিন্তু এই বালাই আপনার 'ইষ্ট কবচ'। সে যাই বলুক আর যাই করুক আপনি প্রাণান্তেও এই বালা খোলবার চেষ্টা করবেন না।" রোজা যা বলেছিল তাই হল। নরেন পরদিন রাত্রে দরজা বন্ধ করে ঘরে শুয়েছে আর মালতী ঘরের বাইরে থেকে শিকড়টি খুলে ফেলবার জন্য অনুনয় বিনয় করছে, আজ আর সে বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে

ঘরে আসতে পারলে না। নরেন মালতীর কথার কোন জবাব দিলে না। প্রথম দু' তিন রাত্রি অনুনয়-বিনয় ও পরে ভয় প্রদর্শন "আমার কথা না শুনলে, আমি তোমার প্রাণ নেব, কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না।" কিন্তু নরেন নিরুত্তর। এই উপদ্রব আট-দশ দিন চলেছিল তার পরে আর মালতী আসেনি। নরেন তার বাবার সঙ্গে গ্রামে ফিরে গেল এবং মা-বাবার আদর-যত্নে অতি শীঘ্রই তার পূর্ব স্বাস্থ্য ও মনের বল ফিরে পেল। নরেনের আনন্দ, মা-বাবার আনন্দ, আত্মীয়স্বজনের আনন্দ, প্রতিবেশীদের আনন্দ, জমিদারবাবু ও তাঁর পরিবারবর্গের আনন্দ, আর সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে রোজার। শুধু সে যে একটি অমূল্য জীবন রক্ষা করেছে তাই নয়, সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে শুধু তাও নয়, জমিদারবাবু তার কোঁচড় টাকায় ভরে দিয়েছিলেন।*

* এই গল্পটি আমি খুব ছোটবেলায় শুনেছিলাম। —লেখক।

মাছ ধরার গল্প

মাছ ধরার কাহিনী লিখতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে—লণ্ডন "পাঞ্চের" (Punch) সেই কার্টুনের কথা। এক মাতাল সাহেব সন্ধ্যের পর এক মাঠের ধার দিয়ে বাড়ী ফিরছেন। মাঠটি হচ্ছে একটি শস্যক্ষেত্র, তার মধ্যে রয়েছে একটি "কাক-তাড়ুয়া", যাকে ইংরাজীতে বলে "scare-crow"। কাক-তাড়ুয়াটি হচ্ছে একটি লম্বা কাঠের ডাণ্ডার ওপর একটি মাথার মতন হাঁড়ি বসান, আর তাতে খড়ি দিয়ে চোখ-মুখ আঁকা, আর ক্রসের মত এই ডাণ্ডাটির পেটের ওপর আর একটি ডাণ্ডা বাঁধা ; ঠিক এই রকম দেখতে :—

যা দেখলে পশু-পক্ষী মনে করবে যে, একটা মানুষ হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেইজন্যে শস্যক্ষেত্রে ভয়ে আসবে না। মাতালটি, কাক-তাড়ুয়াটি দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল আর চীৎকার করে বললে, "You are a damn liar, sir", অর্থাৎ কিনা, "আপনি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী, মশায়।" এক কনেস্টবল মাতালকে দেখতে পেয়ে বললে, "কি, মশায়, কাকে মিথ্যাবাদী বলছেন ?" মাতালটা বললে, "দেখছেন না, কি রকম মিথ্যাবাদী। অত বড়

মাছ হয়? বেটা ধরেছে হয়ত একটা সের দেড়েক মাছ, আর হাত মেলে দেখাচ্ছে যেন সেটা দু' মন।"

মাতালটি যা বলেছিল তা' একেবারে মিথ্যা নয়। মেছুড়েদের মাছের সাইজ বাড়িয়ে বলা একটা ব্যায়রাম। আর সেই গল্পটা যতবারই বলেন, মাছের সাইজটা ক্রমেই বেড়ে যায়। আরও একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যে মাছটা পালিয়ে যায়, সেটা প্রায়ই প্রকাণ্ড মাছ হয়ে থাকে। আমার এক বন্ধুর খুব মাছ ধরার শখ। একবার একটা রুই মাছকে খেলাতে খেলাতে সে মাছটা চলে গিয়েছিল। মাছটা খেলতে খেলতে হঠাৎ জলের ওপরে লাফ দিয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে সুতো গেল ছিঁড়ে। আমরা সকলেই মাছটাকে দেখতে পেয়েছিলাম। মাছটা পাঁচ-ছ সের হবে। কিন্তু আমার বন্ধু বললেন দশ-বার সের। আমরা তাঁর কথায় সায় দিলুম, কারণ মাছটা চলে যাওয়াতে তাঁর মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল; আমরা সেই সময় তাঁর সঙ্গে তর্ক করে আর তাঁর মনে ব্যথা দিতে চাইলুম না। কিন্তু তারপর যখনই তিনি এই দুর্ঘটনার কথা গল্প করতেন, তখনই মাছের সাইজটা বাড়াতেন। পরে দশ-বার সের থেকে তিনি মাছটাকে ক্রমে কুড়ি-বাইশ সেরে দাঁড় করিয়েছিলেন। শেষে একদিন এক বন্ধুদের মজলিসে তিনি এই গল্পটি বললেন, "মাছটা বেকসুর সের তিরিশেক ছিল। হয়, না হয়, তুষারকে জিজ্ঞাসা কর।" আমি মুশকিলে পড়ে গেলুম। তবে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া না করে শুধু বললুম, "মাছটা বড় ছিল নিশ্চয়। তবে তার ওজন কত হবে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে জানলে মাছটা পালিয়ে যাবার আগে সেটাকে ওজন করে নিতুম।"

আমি নিজে মেছুড়ে নই, যদিও বার কতক মাছ ধরেছি বটে। আমার সবচেয়ে ভাল লাগে ছোট মাছ ধরতে,—যেমন পুঁটি, চেলা, বাটা, ছোট পোনা ইত্যাদি। এরা খুব তাড়াতাড়ি খায়, বেশী ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় না। আমার মোটেই ধৈর্য নেই, সেইজন্য

বড় মাছ ধরবার কষ্ট নিতে চাই না। আমার সবচেয়ে বড় মাছ হচ্ছে একটা পাঁচ সের রুই মাছ। সেটা ধরেছিলুম কেলোমালের (মেদিনীপুর) শ্রীবৈদ্যনাথ সরকারের বাড়ীতে। তখন আমার শ্বশুর ছিলেন তমলুকের সেকেণ্ড অফিসার। বৈদ্যনাথ আমাদের আত্মীয়। আমি পুজোর সময় তিন-চার দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলুম। একদিন বৈদ্যনাথের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে গেছি। গিয়ে মাছ ধরার শখ হল। বৈদ্যনাথ আমার মাছ ধরার কথা শুনে হেসেই খুন। শেষে একটা পুঁটি মাছের ছিপ দিলে। আমি তার হাসি দেখে জোর ক'রে একটা হুইলওলা ছিপ নিলুম এবং ভাগ্যক্রমে আধ ঘণ্টার ভিতরেই মাছটা ধরলুম। মাছটার তখনি সকলের সামনে ওজন নেওয়া হয়েছিল, নইলে পাছে বিশ্বাস না করে।

মাছ ধরার ধৈর্যের কথা বলতে গেলে স্বীকার করতে হবে যে, এত ধৈর্য আর কিছুতে লাগে না। মাথার ওপর প্রচণ্ড রোদ, কিন্তু যিনি মাছ ধরছেন তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। হয়তো বৃষ্টি এল, তাতেই বা কি হয়েছে! তিনি ফাতনার দিকে বদ্ধ দৃষ্টি হয়ে ঠায় বসে আছেন। ভোরবেলা এসেছেন। সারাদিনে হয়তো ভাগ্যে দু' স্লাইস পাঁউরুটি মাত্র জুটেছে। কিন্তু তাতে কি? তিনি একমনে এক ধ্যানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছেন।

একবার এই রকম এক মেছুড়ে এক পাগলের কাছে বোকা ব'নে গিয়েছিলেন। তিনি এক দীঘিতে মাছ ধরছেন। দীঘিটার পাশেই উঁচু পাঁচিল দেওয়া পাগলা-গারদ। তিনি সকালে এসে বসেছেন, বিকেল হয়ে এল, তবু একটিও মাছ পাননি। এমন সময় এক পাগল দোতলার জানলা থেকে বললে, "কি মশায়, কতক্ষণ বসে আছেন?"

ভদ্রলোক—সকাল থেকে। আট-দশ ঘণ্টা হল।

পাগল—মাছ-টাছ কিছু পেলেন?

ভদ্রলোক—আজ্ঞে, না।

পাগল—তাহ'লে আর বাইরে কেন ? ভেতরে চলে আসুন।

আমাদের অমৃতবাজার পত্রিকার প্রিন্টার বিজলীকান্তি ঘোষের এই রকম ধৈর্য। সপ্তাহে ছুটির দিন সে মাছ ধরতে যাবেই। আর বাকি ছয় দিন তার তোড়জোড়। চারের মশলাই-বা কত রকম! কত রকম experiment (পরীক্ষা) চলে। কিসে মাছ আকৃষ্ট হবে, এই চেষ্টা। কারণ সে যায় পাসের পুকুরে মাছ ধরতে। কত লোক পাস নিয়েছে, কত রকম তাদের চার। তাদের ভেতর থেকে মাছকে লোভ দেখাতে হবে। তাও আবার ঘ্যাচড়া মাছ। হয়তো আগে বঁড়শির আস্বাদ পেয়েছে। সহজে ভোলবার ভবী নয়। সেইজন্য বিজলীর বহু যোগাড়-যন্ত্র। আমি তার সঙ্গে বার কতক মাছ ধরতে গেছি। অর্থাৎ কিনা তার মাছ ধরবার সময় উপস্থিত ছিলুম। আগেই বলেছি, আমার বড় মাছ ধরবার ধৈর্য নেই। আমি সঙ্গে থাকি শুধু পিকনিকের লোভে। পুকুর পাড়ে শতরঞ্চি তাকিয়া পেতে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি, আর মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞেস করছি, "কই হে, তোমার মাছের কত দূর ?" তারপর বিকেলবেলা থার্মফ্লাস্ক থেকে চা সেবন ও সন্ধ্যের আগেই গৃহে প্রত্যাগমন।

বিজলী বলে, আমি নাকি অপয়া। কারণ দু'তিন দিন ছাড়া তাকে আমি মাছ ডাঙায় তুলতে দেখিনি। তবে বহুবার খেলাতে খেলাতে মাছ খুলে যেতে ও বার কয়েক ছিপ ভাঙ্গতে দেখেছি। এ সব নাকি আমার অপয়ার ফল! আমি যখন সঙ্গে থাকি না, তখনি নাকি বিজলী মাছ পায়।

একবার বিজলী আমাকে একটা বড় কাতলা মাছের মুড়ো পাঠিয়ে দিলে। মাছটা সের দশেকের। বিজলী মুড়োটা পাঠাবার আগে বলে গিয়েছিল যে, মুড়ো আসছে। বিজলীর কাছে এই মাছ ধরার গল্পটাও আমি তখন শুনেছিলুম। মাছটার নাকি ল্যাজে বঁড়শি বিঁধেছিল। সে আধ ঘণ্টা খেলেছিল—বিজলী তার জ্বলন্ত বর্ণনা দিলে। শুধু তাই না। কেমন করে চার করেছিল, কত

ভোরে কি খেয়ে সে 'গোলাম জেলেনি'তে গিয়েছিল। 'গোলাম জেলেনি' ধাপার দিকে তপসিয়াতে একটি প্রকাণ্ড জলা। এখানে খুব বড় বড় মাছ আছে, পাসের দাম কত, বসবার স্থান নিয়ে কি রকম ঝগড়া হয়েছিল—এ সবের বর্ণনা। অত বড় মাছটা ধরার পর তাকে আনার প্রবেলম। 'গোলাম জেলেনি'তে ট্রাম-বাস নেই। কত করে রিক্সা যোগাড় করে সে মাছ বাড়ী এনেছিল, বিজলী সব বললে। আমি খুব আহ্লাদ প্রকাশ করলুম আর তাকে মুড়ো দেবার জন্য ধন্যবাদ ও অনুযোগ প্রকাশ করলুম।

একে বেচারি প্রায়ই মাছ পায় না। একদিন পেয়েছে, তার মুড়োটা আমায় দেবে কেন? আমি বললুম, "তুমি বরঞ্চ খানিকটা মাছ পাঠিয়ে দাও।" বিজলী শোনে না, বলে, "সে কি হয়? তোমায় মুড়ো দিয়ে কি আমার কম আনন্দ!" আমি অনেক তর্ক করলুম কিন্তু সে কিছুতেই মুড়োর বদলে মাছ দিতে রাজী হ'ল না।

সন্ধ্যের সময় মুড়ো এল। দেখলুম যে, মুড়োটা বড় বটে, তবে গায়ে মোটে মাছ নেই। কানকোর পাশ থেকে পুঁচিয়ে কাটা। তাই সেটাকে মুড়িঘণ্টর ডাল করতে বলে একবার বেড়াতে বেড়াতে বিজলীর বাড়ীর দিকে গেলুম। বিজলী আমার জ্ঞাতি ভাই ও বয়সে কিছু বড়। ইচ্ছে ছিল বিজলীকে গিয়ে বলব যে, মুড়োটা যখন কাটলে তখন তার সঙ্গে একটু মাছ রেখে কাটলে কি ক্ষতি হত?

যাই হোক, বিজলীর বাড়ী গিয়ে দেখি যে, সে বাড়ী নেই। তখন বিজলীর স্ত্রীকে বললুম, "মাছের মুড়োটা যে পাঠালে, তার সঙ্গে কি একটু মাছ রাখতে নেই? এমন করে মুড়ো কাটতে কোথায় শিখলে?"

তিনি বললেন, "আমার দোষ কি বল? তিনি ত শুধু ঐ মুড়োটাই এনে দিয়েছেন, মাছ ত কিছু আনেননি। মুড়োটা এনে বললেন, 'এইটে তুষারকান্তির বাড়ী পাঠিয়ে দাও। অনেক দিন মাছ চেয়েছে, তাই আজ এই মুড়োটা দিলুম।' আর তাও বলি, বাজারের মুড়ো ত ঐ রকম করেই কাটে। ঘাড়ের কাছে কোন মাছ তো রাখে না।" তখন আমি বুঝলুম কেন বিজলী আমায় মুড়ো দেবেই—কিছুতেই মাছ দেবে না। যাই হোক, বিজলীর স্ত্রীকে আমি আর কিছু বলিনি।

বিজলী কিন্তু চমৎকার গল্প বলতে পারে। তার বহু মাছ ধরার গল্প আমি শুনেছি। এ বয়সেও তার মাছ ধরার বাতিক সমানই আছে। সুযোগ পেলেই মাছ ধরতে যায়। কলকাতার প্রায় সব পাসের পুকুরেই সে মাছ ধরতে বসেছে—এমন কি মাছের খবর পেয়ে কলকাতার বাইরেও সে বহু জায়গায় গিয়েছে।

আমার ভাইপো শচীবিলাসও আর এক মেছুড়ে। এমন সময় ছিল যখন সে প্রত্যেক রবিবারে মাছ ধরতে যেত। ক্যানিং-এর ডক ট্যাঙ্কে আমি সত্যিই তাকে দু'টো বড় মাছ ধরতে দেখেছিলুম।

একটা বার সের ও অন্যটা আঠার সেরের কাতলা। একটার মুখে ও অন্যটার ল্যাজে বঁড়শি লেগেছিল। বেশ চমৎকার খেলিয়ে সে মাছ দু'টো ধরলে।

শচীর মাছ ধরার কথা এত স্পষ্ট মনে আছে এইজন্যে যে সেবারে ক্যানিং-এ যে রকম পিক্‌নিক্ হয়েছিল, তেমন আর কখনও হয়নি। আমাদের যে দল ক্যানিং-এ মাছ ধরতে গিয়েছিল, তার মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিল—যেমন আমি। আমি শুধু পিক্‌নিকের লোভে

এই দলের সঙ্গী হয়েছিলুম ; তেমনি কয়েকজন খাইয়ে লোক ছিল— যারা শুধু ভোজের লোভে মেছুড়েদের দলে ভিড়েছিল, যেমন মজিল-পুরের সুধীরগোপাল দত্ত।

যেদিন শচী মাছ দুটো ধরলে, সেদিন ঠিক হোল রাত্রে গরম মাছ ভাজা ও খিচুড়ি খাওয়া হবে। রাঁধবার ভার নিলেন রাধাবাজারের বিখ্যাত দত্তবাবু এবং ঘোষ ব্রাদার্সের ভুপে'দা। সবাই বললেন "দেখো হে, খিচুড়ি যেন বোদা না হয়। আমরা

বাঙাল মানুষ, একটু ঝাল খেয়ে থাকি।" তাঁরা হু'জনেই বললেন, "তোমাদের ভয় নেই, আমরাও ঝাল খেয়ে থাকি।" তারপরে তাঁরা তোলা উনুনে রান্না শুরু করলেন ও আমরা অন্য ঘরে তাস খেলতে গেলুম।

তখন আমি জানতুম না যে, দত্তবাবু ও ভুপে'দা—দুজনেই মনের ফুর্তিতে সেদিন সন্ধ্যের সময় সিদ্ধি খেয়েছিলেন। সেইজন্যে সব কথা তাঁদের মনে থাকছিল না। তাঁরা খিচুড়ি রাঁধছেন ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন "কি হে, লঙ্কা দিতে ভুলিনি তো?" আর খানিকটা করে লঙ্কাবাটা আর আস্ত লঙ্কা খিচুড়ির মধ্যে ফেলছেন। তাঁরা হু'জন এ-ঘর ও-ঘর করছেন, আর যখনই যিনি উনুনের কাছে আসছেন, তিনিই খিচুড়িতে লঙ্কা দিচ্ছেন,—হু'জনেরই

মনে ভয়, পাছে লঙ্কা দিতে ভুল হয়। এই রকমে প্রায় রাত দশটার সময়ে রান্না শেষ হোল, আর আমরা সকলে দল বেঁধে খেতে বসলুম।

প্রথমে আমরা হু'চার খানা করে গরম মাছভাজা খেলুম। চমৎকার মাছের আস্বাদ আর সকলেই শচীর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। তার পরে এলো খিচুড়ি—এক গ্রাস মুখে দিয়েই সকলের চিৎকার। "ওরে বাবা রে, একি রে? মুখ যে জ্বলে গেল।" এমন ঝাল আমরা

জীবনে খাইনি। তার পরে পাতের দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখি যে যত চাল ডাল তত লঙ্কা—এ ছাড়া লঙ্কাবাটাও তা'র মধ্যে ছিল। আমরা সবাই লঙ্কা বাছতে শুরু করলুম। কিন্তু তাতে কি ঝাল কমে? চাল ডালের সঙ্গে লঙ্কার রস ও লঙ্কাবাটা তো আগেই মিশে গেছে। তবুও খেতে তো হবে। অনেক ঘি মেখে কোন রকমে দু'এক গ্রাস খেলুম। তখন জিভের অবস্থা এমন হয়েছে যে আস্ত লঙ্কা চিবোলেও কোন ঝাল টের পাচ্ছি না। এ'র সঙ্গে খানিকটা করে দইও খেলুম। তবুও তার পরদিন সকালের অবস্থার কথা না বলাই ভাল।

এখন শচীকে ডাক-টিকিটে পেয়েছে। এখন সময় পেলেই সে ডাক-টিকিটের অ্যালবাম্ নিয়ে বসে, আর তাতেই তন্ময়। এখন শচীর মাছধরা, শিকার, খেলা-ধুলো—সব গিয়েছে।

আমার ছোট জামাইবাবু, স্বর্গীয় নাটুগোপাল সরকারের একবার অদ্ভুত মাছ ধরা দেখেছিলুম। তাঁর দেশ ছিল হাওড়ার কাছে পোদ্‌ড়া গ্রামে। একবার দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে পোদ্‌ড়ায় আছি। তাঁদের দু'তিনটে পুকুর। একটা বেশ বড়। বড়টায় বছর বছর মাছ ছাড়া হয়, কিন্তু মাছ থাকে না। কিসে যেন খেয়ে যায়। এ নিয়ে অনেক গবেষণা হল। কেউ বললে ভোঁদড়, কেউ বললে ভাম—আবার কেউ বললে পুকুরে বড় বড় সাপ আছে, তারাই মাছ খেয়ে ফেলে।

প্রথমে ভোঁদড়-ভামের 'চিকিৎসা' করা হল। চিকিৎসা আর কিছুই নয়, কেবল পুকুরের চার কোণেতে কুলকাঁটা ঘন করে ফেলে রাখা,—কারণ ভোঁদড়রা পুকুরের কোণ দিয়ে জলে নাবে। আর হচ্ছে রাত্রে বন্দুক নিয়ে বসে থাকা। কোন চিকিৎসাতেই কোন ফল হল না। ভোঁদড়ের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। এই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

একটা ছাগলের দু'টো বাচ্চা হয়েছিল। মোটে দু' তিন দিনের

বাচ্চা। তাদের মা ঐ বড় পুকুরের পাড়ে জলের ধারে ঘাস খাচ্ছিল এবং বাচ্চা দু'টো আশে-পাশে নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছিল। সেই দিকের পাড়টা খুব খাড়া ছিল এবং কেমন করে জানি না একটা বাচ্চা জলে পড়ে যায়। সেখানে জলটা ছিল গভীর। সেই জন্যে বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্যে একটি লোক জলে নেবে বাচ্চাটিকে তুলতে গেল। সেই সময় একটা কি জানোয়ার হঠাৎ হাঁ করে এসে

সেই বাচ্চাটিকে মুখে করে জলে ডুবিয়ে নিলে। সেই জানোয়ারটা আর কিছু নয়, একটা প্রকাণ্ড বড় বোয়াল মাছ। যখন সে এসে ছাগলের বাচ্চাটাকে ধরে, তখন সেই লোকটি মাছটার মাথাটা দেখতে পেয়েছিল। বিরাট হাঁ এবং মুখে বড় বড় গোঁফ। লোকটি এই দেখেই চীৎকার করে লোকজন ডাকতে লাগল। আমিও আমার জামাইবাবুর সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হলুম। তখন সকলেরই খুব উত্তেজনা। সেই লোকটি বললে যে, মাছটি বিরাট,—চার পাঁচ হাতের কম নয়। এত বড় বোয়াল মাছ হয় কি না তাই নিয়ে আমরা তর্ক করতে লাগলুম। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বললেন যে, খুব

হয়। "না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে" এই পদ্যটি আমাদের মনে পড়ে গেল। আরও মনে প'ড়ে গেল "হারাধনের তিনটি ছেলে, ধ'রতে গেল রুই, একটি নিলে বোয়াল মাছে রইল বাকি দুই।" এতদিনে বোঝা গেল যে, কিসে পুকুরের মাছ শেষ করে ফেলছে। এখন করা যায় কি? কি করে এটাকে ধ্বংস করা যায়?

কেউ কেউ বললেন যে পুকুরে জাল দেওয়া হোক। এর আগে পুকুরে বেড়াজাল দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এটা তো কখনো ধরা পড়েনি। খুব সম্ভব; ভাঙা ঘাটের ফাটলে ঢুকে বসে থাকত। আমার জামাইবাবু বললেন যে, তিনি এটাকে ছিপে ধরবেন। তবে সাধারণ সুতো বঁড়শিতে একে ধরা যাবে না। এর জন্যে বিশেষ বন্দোবস্ত করতে হবে এবং সে বন্দোবস্ত দু' তিনদিনের আগে সমাপ্ত হবে না। সকলেই বললে যে, যে করেই হোক আপনি এ মাছটা ধরবেন।

জামাইবাবু তার পরদিনই কলকাতায় চলে এলেন এবং দু'দিন বাদেই তাঁর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে এলেন। সাজ-সরঞ্জাম হচ্ছে এই: একটি প্রকাণ্ড বড় বঁড়শি, আর সুতো হচ্ছে পেতলের তার, আর তার ওপরে মুগার সুতো জড়ানো, যাতে মাছটা তার বলে বুঝতে না পারে, অথচ তার দাঁতে যেন সুতো কেটে না যায়।

জামাইবাবু একটি প্রকাণ্ড বাঁশেতে এই সুতো-বঁড়শি বাঁধলেন এবং বাঁশের ডগায় একটি টর্চ বেঁধে দিলেন। তিনি রাত্রে খেয়েদেয়ে পুকুরঘাটে গিয়ে সেই বঁড়শিতে পাঁঠার নাড়িভুড়ি দিয়ে টোপ গাঁথলেন এবং ঐ টোপ জলে ফেলে তিনি আস্তে আস্তে বাঁশটা নাড়তে লাগলেন যাতে বোয়াল মাছটার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। টর্চের আলোতে মাছটার নজর পড়বে; এবং কাছে আসবে এবং টোপ নড়তে থাকার দরুন শীঘ্রই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। জামাইবাবু এইভাবে প্রায় রাত্রি একটা পর্যন্ত বসে রইলেন, কিন্তু কোন ফল হলো না। পরের রাত্রেও তাঁর বসা নিষ্ফল হলো।

তৃতীয় রাত্রে তিনি ছিপ ফেলেছেন আর আমরা সবাই সবে বসে গল্প আরম্ভ করেছি, এমন সময় সুতোয় পড়ল টান আর জামাইবাবু সেই বাঁশ নিয়ে এক খ্যাঁচ মারলেন, আর মাছটা গেল আটকে। কিন্তু মাছটাকে আনা যাবে কি করে? এতো আর পোনা মাছ নয়, যে খেলবে! মাছটা পাথরের মতো ডুবে গেল আর মাটিতে চেপে বসল। তারের সুতো, ছেঁড়বার ভয় নেই—সেই জন্য জামাইবাবু নির্ভয়ে হেঁচকা দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে মাছটা মাটি ছেড়ে উঠে পড়ল। কিন্তু একটুখানি গিয়েই আবার মাটি নিলে। আবার জামাইবাবু হেঁচকা টান দিতে লাগলেন এবং মাছটা আবার খানিক দূরে গিয়ে বসলো। এরূপ করতে করতে বহুক্ষণ বাদে জামাইবাবু মাছটাকে খানিকটা পাড়ের দিকে নিয়ে এলেন। পুকুর পাড়ে তখন বিস্তর লোক জমেছে। তাদের মধ্যে ক'জন জেলেও ছিল। তারা বাড়ীতে ছুটে গিয়ে কঁ্যাচা আর চবক নিয়ে এলো। তাদের মধ্যে জন দুই কোমর জলে নেবে সে কঁ্যাচা আর চবক দিয়ে মাছটাকে উপর্যুপরি আঘাত করে কাবু করে ফেললে। তারপরে সে বিরাট মাছ ডাঙায় তোলা হলো। এত বড় মাছ আমরা তো কখনো দেখিনি, যাঁরা সেখানে অতি বৃদ্ধ লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও এত বড় মাছ দেখেননি। এখন প্রশ্ন হোল যে, এই রাক্ষস পুকুরে এলো কি করে! পরে আমরা জানতে পারলুম যে এই পুকুরের সঙ্গে গঙ্গার একটি যোগ আছে। নিশ্চয় এই সুড়ঙ্গ দিয়ে কোন রকমে মাছটি এই পুকুরে ঢুকে পড়েছিল। খুব ছোট অবস্থায় বোয়াল মাছ পুকুরে আসে এবং পরে বড় হয়। এর প্রমাণ আমি আমার বারাসতের বাড়ীর বাগানে পেয়েছি। বারাসত উঁচু জায়গা বলে এখানকার পুকুরে জল বেশী থাকে না। সেই জন্যে বারাসতের পুকুরের মালিকরা রাস্তার নালি থেকে সুড়ঙ্গ কেটে বর্ষার সময় পুকুরে জল নেন। আমিও বছর ছয়-সাত আগে আমার পুকুরে এইভাবে জল নিতুম। জল প্রায় শুকিয়ে যেত বলে আমার

এই পুকুরটিকে কাটিয়ে বড় করবার ইচ্ছে হয়। পাম্পে করে স্বল্পাবশিষ্ট জল যখন তুলে ফেলা হলো তখন আমরা দেখলুম যে, দু'টো দু' হাত লম্বা বোয়াল মাছ রয়েছে। এই পুকুর এর আগেও একবার আমি কাটিয়েছিলুম। তা'হলে এই দুই মাছ নিশ্চয়ই পরে ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে এসেছিল। সুড়ঙ্গের মুখে জাল দেওয়া ছিল। সুতরাং খুব বাচ্চা অবস্থায় এরা পুকুরে প্রবেশ করেছিল। এর পর থেকে অবশ্য পুকুরে বাইরের জল নেওয়া আমি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি। পোদ্ড়ার বোয়াল মাছের ভাগা সকলকেই দেওয়া হয়েছিল। আমরা সবাই পেট ভরে এই বোয়ালের টিকলি খেয়েছিলুম।

বোয়াল মাছের ছাগল ছানা খাওয়ার কথাটা যাঁদের কাছে অদ্ভুত মনে হয় তাঁদের আমি আর একটি ঘটনার কথা বলতে চাই। এটি এলাহাবাদে ম্যাক্ফারসন্ লেকে ঘটেছিল। যাঁরা এলাহাবাদে গিয়েছেন তাঁদের কাছে ম্যাক্ফারসন্ লেকটি অজানা নয়। এটি গঙ্গার ধারে একটি প্রকাণ্ড দীঘি—বলতে গেলে জোড়া দীঘি। প্রকাণ্ড দু'টো দীঘি একটি ঝিলের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে আছে। এখানে সব রকমের প্রকাণ্ড মাছ পাওয়া যায়। এটি পাসের পুকুর, সেই জন্যে জাল ফেলা নিষিদ্ধ। বহুলোক এখানে মাচা করে মাছ ধরে থাকেন। যখন ইংরেজরা ছিল তখন এখানে বহু সাহেব মাছ ধরতো। ম্যাক্ফারসন লেকটি ক্যানটুন্‌মেণ্ট এলাকার মধ্যে বলে বড় বড় জঙ্গী-সাহেবেরা এখানে মাছ ধরতো। এখন অবশ্য সেখানে দেশীয়রা মাছ ধরে থাকেন। আমাদের অফিসের ভোলাবাবু ম্যাক্ফারসন্ লেকের নিয়মিত খদ্দের। তাঁর মাচা বাঁধা আছে এবং সময় পেলেই সেখানে হুইল নিয়ে বসেন। শুধু ভোলাবাবু কেন, আমাদের অফিসের অনেকেই সেখানে মাছ ধরে থাকেন। সত্যের খাতিরে বলতে হবে ভোলাবাবু এখানে অনেকগুলি বড় মাছ ধরেছেন—বেশীর ভাগই রুই-কাতলা। ভোলাবাবুর কাছেই এই ঘটনাটি শুনেছি।

একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে ভোলাবাবু মাচায় বসে আছেন, আর মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক দেখছেন। তিনি দেখলেন কিছু দূরে জলের ধার থেকে দু'তিন হাত তফাতে একটি ভিজে জায়গায় চার-পাঁচটি টিটিটুয়া পাখী বসে আছে। এই পাখীর আসল নাম আমরা জানি না। বোধ হয় এ'র নাম ভরত পাখী হবে। নীলমতন পাখী, জলের কাছাকাছি ধানক্ষেতে, জলার ধারে কিম্বা নদীর তীরে প্রায়ই এদের দেখতে পাওয়া যায়। চাহা কিম্বা হাঁস মারতে গেলে এরা বড়ই গোলমাল বাধায়। এরা চিৎকার করে অন্য পাখীদের সাবধান করে দেয়। মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে আর চিৎকার করে ডাকে "টি-টি-টুয়া", "টি-টি-টুয়া"। এই পাখীর ডাকের জন্যে আমরা ঐ নাম দিয়েছি।

ভোলাবাবু মধ্যে মধ্যে দেখছেন পাখীগুলো বসে আছে, আবার ফাতনার দিকেও চেয়ে থাকছেন। হঠাৎ একটা হুটোপাটি শব্দ

শুনলেন—আরো শুনলেন সেই পাখীগুলোর আতঙ্কমিশ্রিত চিৎকার। ভোলাবাবু চমকে চেয়ে দেখলেন যে একটা প্রকাণ্ড বড় চিতল মাছ একটা পাখীকে ধরেছে আর বাকী পাখীগুলো উড়ে পড়েছে। পাখীটা মাছের মুখে ছট্‌ফট্ কচ্ছে কিন্তু মাছটা নিমেষের মধ্যে সেটাকে নিয়ে উল্টে জলে পড়ে গেল। যেখানে পাখীগুলো বসেছিল সেটা শ্যাওলাভরা ভিজে জমি এবং ঈষৎ গড়ানে। জল নেমে যাওয়াতে

শ্যাওলা শুকিয়ে গেছে। মাছটা নিশ্চয় জল থেকে লাফ দিয়ে পাখীটিকে ধরেছিল এবং পাখীটি খুব সম্ভবত জলের খুব কাছেই ছিল।

আমি যখন সুন্দর বনে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তখন এক নতুন রকম মাছ ধরা দেখেছিলুম। একদিন এক নোনাগাঙ্গের পাড়ে আমরা রান্নাবান্না করছি। মাছ নেই, শুধু খিচুড়ি ও আলু। মাঝিরা বললে, একটু অপেক্ষা করলেই মাছ পাওয়া যাবে। আমরা বললুম, "কি করে?" মাঝি বললে, "এখন জোয়ারের জলে সব ডুবে রয়েছে। ভাঁটা আরম্ভ হয়ে গেছে। একটু বাদেই দেখবেন ছোট ছোট ডোবায় কত মাছ আটকা পড়েছে।"

সত্যিই তাই হ'ল। একটু একটু করে যখন জোয়ারের জল নেবে গেল, তখন দেখি যে ছোট ছোট ডোবায় বিস্তর মাছ রয়ে গেছে। এই ডোবাগুলো বড় বড় গর্ত মাত্র। ভাঁটার সময় এতে শুধু কাদা থাকে। জোয়ারের সময় জলে ভরে যায়, আর জল সরে গেলে নানারকমের মাছ থেকে যায়। তখন বাঘে কিম্বা শেয়ালে এসে এইসব মাছ খেয়ে থাকে। আমরা দু'তিনটে ডোবা থেকে নানারকমের মাছ ধরলুম। পারশে, পায়রা চাঁদা, ভাঙ্গন, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি নানারকমের মাছ। আমরা একটা বিরাট কাঁকড়া পেয়েছিলুম। তার

দাড়া দেখে আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত। বেটাকে ধরি কি করে? কেউ তার কাছে যেতে সাহস করে না। শেষকালে লাঠি দিয়ে তাকে মারা হল। তার শরীর কিন্তু মাছের মত ছিল না। ঠিক মাংসের আস্বাদ। মদ্দা কাঁকড়া, পেটে কোন ডিমও ছিল না। যাই হোক, শুধু আলু আর খিচুড়ির বদলে সেদিন আমাদের গ্র্যাণ্ড ভোজ হয়েছিল। ডিমভরা পারশে মাছ ভাজা, পায়রা চাঁদার ঝাল আর আর কাঁকড়া চচ্চড়ি।

আমাদের দেশে 'আপা'য় মাছ ধরা হয়। কপোতাক্ষী নদী থেকে একটা সরু খাল এসে একটা বিরাট জলাভূমিতে পড়েছে। আমাদের দেশে তাকে গোগ বলে। বর্ষার পরে জল কমে গেলে যখন এই সরু খালটি শুকিয়ে যায়, তখন নদীর সঙ্গে গোগের সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। এবং গোগে বিস্তর মাছ থেকে যায়। গোগে কচুরিপানা থাকার জন্যে খুব অল্প জায়গায় জাল ফেলা যায়। এখানকার মাছধরার পদ্ধতি হচ্ছে 'আলো-কাঁটা' এবং 'আপা'র সাহায্যে। জলের ধারে একটি বড় গর্ত করে গোগের জলের সঙ্গে একটি সরু নালীর যোগ রাখতে হয় যাতে সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে জল এসে গর্তটি ভরে যায়। এই গর্তের মধ্যে অনেক ডালপালা ফেলে রাখা হয়। এই গর্তকেই 'আপা' বলা হয়। কিছুদিন বাদে জেলেরা এসে প্রথমে গোগের সঙ্গে যে সুড়ঙ্গ আছে সেটি মাটি ফেলে বন্ধ করে দেয়। তারপর সেই গাছপালা তুলে ফেলে। তারপরে সেই জল ছেঁচে ফেলা হয়। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি যে, এই 'আপা'তে সবরকম মাছ বাসা করে থাকে। অধিকাংশই জাওলা মাছ। শাল, শোল, কই, সিঙি, মাগুর, ল্যাঠা, দ্বাদশ বোয়াল, গাংধাড়া, পাঁকাল, কচ্ছপ— এমনকি ঢোঁড়া সাপও 'আপা'র ভেতর পাওয়া যায়।

আলো-কাঁটায় মাছধরার পদ্ধতি হচ্ছে এই ঃ—একটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের একটুখানি বাদ দিয়ে চিমনির বাকী সবটা কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়—যাতে আলোর ফোকাসটা একধারে পড়ে। এক হাতে

এই লণ্ঠন ও অন্য হাতে চবক, এই নিয়ে জলের ধারে-ধারে চলে যেতে হয়। রাত্রে অধিকাংশ মাছই জলের ধারে আসে। এই আলো তাদের চোখে পড়লে তারা স্থির হয়। তখন হাতের চবক দিয়ে তাদের বিঁধে ফেলতে হয়। আমাদের 'অমৃতবাজার' গ্রামে বহুলোক গোগেতে এই পদ্ধতিতে মাছ ধরে থাকে। গোগের অধিকাংশ স্থানে জঙ্গল ব'লে জাল ফেলার অত্যন্ত অসুবিধে। সেইজন্যে আপা এবং আলো-কাঁটার পদ্ধতিতেই এইসব স্থানে মাছ ধরা হয়।

আমাদের দেশে কপোতাক্ষী নদীতে 'আপা'রই মত পদ্ধতিতে আর এক রকম ভাবে মাছধরা হয়। তাকে 'কোমর-ঘেরা' বলে। নদীর কোন একটা স্থানে, যেখানে গভীর জল, বেশ খানিকটা জায়গায় বড় বড় গাছের ডালপালা ফেলে রাখে যাতে জলের ভেতরে একটি জঙ্গলের মতো হয়ে যায়। দু'তিন মাস বাদে জেলেরা পাঁচ-সাতখানা নৌকো এনে সেই জঙ্গলটার চারিদিকে লগি পুঁতে ফেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই লগির গায়ে গায়ে জাল দিয়ে সমস্ত জলের জঙ্গলটাকে ঘিরে ফেলা হয়। জালের ওপরটা বাঁধা থাকে লগির ডগায়, আর নীচেটা থাকে মাটিতে ছুঁয়ে। এই রকমে জাল দিয়ে সমস্ত জায়গাটা সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলবার আগে দু'টি নৌকো তার ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। সম্পূর্ণরূপে জাল বাঁধা শেষ হলে এই দুই নৌকোর সাহায্যে ডালপালাগুলি তুলে তুলে জালের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। যখন জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা হলো, তখন জেলেরা জলে নেবে জালসমেত লগিগুলো কাছে নিয়ে আসতে থাকে যাতে ঘেরাটা ক্রমেই ছোট হয়ে যায়। যখন জায়গাটা যথেষ্ট পরিমাণে ছোট হয়ে গেল তখন জেলেরা জলে ডুবে ডুবে জালের তলাগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয় যাতে নীচে দিয়ে কোন মাছ পালিয়ে যেতে না পারে। তারপরে যখন জাল টানতে আরম্ভ করে তখন সমস্ত মাছ উঠে আসে। সেই সময় মাছেরা লাফ দিয়ে জাল ডিঙ্গিয়ে পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু জাল এত উঁচুতে বাঁধা থাকে যে মাছেরা তা

লাফ দিয়ে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। এই কোমর-ঘেরায় নদীর সব রকম মাছই ধরা পড়ে। এই কোমরেতে আমরা বড় বড় রুই-কাতলা পড়তে দেখেছি, যাকে আমাদের দেশে 'নলা' মাছ বলে। এ ছাড়া ভেটকী, ভাঙ্গন ইত্যাদি তো আছেই।

আমাদের দেশে বন-মাদারের বিল বলে একটি প্রকাণ্ড জলা আছে। একবার আমার মাতুল হরিমোহন বিশ্বাসের সঙ্গে সেখানে মাছ ধরতে গিয়েছিলুম। আমার সেই মামা এখন স্বর্গে। বর্ষার সময় এই জলা আট-দশ মাইলব্যাপী হয়ে থাকে। জলার বহু স্থানে জঙ্গল, কিন্তু পরিষ্কার জলেরও অভাব নেই। এই বন-মাদারের বিলে বিস্তর পাখী ; তাই বহু লোক এখানে শিকার করতে যান। আমার মামা একদিন বললেন, "এখানে পাখী শিকারে তো সকলেই গিয়ে থাকেন। চলো, একদিন হুইল ছিপে মাছ ধরা যাক। এটা বহু পুরনো জলা। এতে এক মন ওজনের মাছও পাওয়া যেতে পারে।"

এই পরামর্শ মতো একদিন আমি, বিজলী ও মামা বন-মাদারের বিলে মাছ ধরতে গেলুম। আমাদের তিন জনের তিন রকমের ডিউটি (কার্য) হ'লো। মামা মাছ ধরবেন, বিজলী চার ফেলবে ও টোপ গেঁথে দেবে এবং আমি দর্শকমাত্র। একখানি ছোট নৌকোতে আমরা তিন জন একটিমাত্র মাঝি নিয়ে বিলের ভেতরে প্রবেশ করলুম। মামা মাঝিকে বললেন, "যে দিকে গভীর জল তুমি সেই দিকে নিয়ে চল।" বিলের সমস্তটাই মাঝির নখ-দর্পণে ছিল। কচুরীপানা, পদ্মবন ইত্যাদি ছাড়িয়ে মাঝি আমাদের পরিষ্কার জলের দিকে নিয়ে গেল। সেখানে জল খুব গভীর, দশ-বারো হাতের কম নয়। এইখানে চার করা হ'লো। এখানে একটি বড় বাঁশ পুঁতে নৌকোটি সেখানে বেঁধে রাখা হ'লো। বিলে মাছ ধরবেন বলে মামা একটি প্রকাণ্ড বড় হুইল এনেছিলেন, এবং সেটা শক্ত সুতোয় ভর্তি ছিল। বঁড়শি দু'টো ছিল প্রকাণ্ড এবং খুব মজবুত। আমার সঙ্গে ছিল একটি বন্দুক। পাখী না মারলেও অনেক সময় এই বিলে কেউটে সাপের

সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া অবশ্য থার্মোফ্লাস্কে চা এবং লুচি ও আলুর দম প্রচুর পরিমাণে ছিল। মামা ছিপ ফেলবার আগে আমার কাছে কড়ার করিয়ে নিলেন যে, আমি যেন ছটফট না করি এবং দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই যেন ফিরে যেতে না চাই। মামা বললেন, "এখন বেলা দশটা। এই আমি ছিপ ফেললুম। সন্ধ্যের আগে কিন্তু আমি ফিরছি না। তুমি যদি ধৈর্য ধরে থাকো তাহলে আমি তোমাকে বড় মাছ খাওয়াব।" আমি বললুম, "যদি তুমি বড় মাছ খাওয়াবার গ্যারান্টি দাও তাহলে আমি সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকতে রাজি আছি। আমার কাছে খাবার আছে, চা আছে, কুঁজোয় জল আছে, আর গল্পের বই আছে।"

মামা ছিপ ফেলে ব'সে আছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে বিজলী টোপ বদলে দিচ্ছে আর চার ফেলছে। মাছের কিন্তু কোন সাড়া নেই। আষাঢ় মাস। রোদে কাঠ ফাটছে। আমি আর বিজলী ছাতা মাথায় দিয়ে বসে আছি। মামার কষ্ট হচ্ছে বলে একবার ছাতাটি তাঁর মাথায় দিতে গেলুম। তাতে মামার কাছে এক দাবড়ানি খেলুম। তিনি বললেন, "অত আরাম করলে মাছ ধরা হয় না।" মামার মাথায় এক লাল গামছা বাঁধা। মধ্যে মধ্যে তাতে জল থাবড়ে সেটা ভিজিয়ে নিচ্ছেন।

বেলা বারোটার সময় আমি আর বিজলী পেটটি ভরে খেয়ে নিলুম। মামার খাবার কোন চাড় নেই। খাবার কথা ব'লতে গিয়ে আরেক দফা দাবড়ানি খেলুম। শেষকালে অনেক বলাতে এক খানি লুচি ও একটি আলু মুখে দিয়ে একটু চা খেলেন। বেলা দু'টো নাগাদ ভীষণ মেঘ করে এলো। তার পরেই ঝমাঝম্ বৃষ্টি। আমি আর বিজলী ছাতা মাথায় দিয়ে গুটি-শুটি হয়ে বসলুম। মামার কিন্তু বৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ঠায় ফাতনার দিকে চেয়ে বসে আছেন। খানিক বাদে বৃষ্টি থেমে গিয়ে আবার রোদ উঠল। আমরাও ফাতনার দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ দেখি সেটা আস্তে আস্তে ডুবে

যাচ্ছে। মামা মারলেন এক খ্যাঁচ। কিন্তু মাছ তো দৌড়লো না। মনে হলো যেন বঁড়শিটা একটা কাঠে আটকে গেছে। বঁড়শি ছাড়াবার জন্যে মামা ছিপ নিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ বাদে মনে হ'লো যে, যেটাতে বঁড়শি আটকেছে সেটা যেন

আস্তে আস্তে চলছে। তখন আমরা মনে করলুম, হয়ত একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপে এই টোপ খেয়েছে। সেই জানোয়ারটা একটু বাদেই আবার বসে গেল। আবার মামার ভীষণ টানাটানি। সেটা আবার একটু একটু চলতে লাগল। এইভাবে মামা তিনটে থেকে পাঁচটা অবধি সেই জানোয়ারটার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুতেই তাকে কায়দা করতে পারলেন না। এদিকে আবার মেঘ করে এল। মাঝি তখন বললে যে সে বাঁশ দিয়ে ওই জানোয়ারটাকে খোঁচাবে। এতে যদি সুতো ছিঁড়ে যায় তো যাক। একথা বলাই বাহুল্য যে এতক্ষণেও মাছটা খুব অল্পই সুতো নিয়েছে—অর্থাৎ কি না আমাদের নৌকো যে বাঁশে বাঁধা ছিল তার কাছেই মাছটা তখনো রয়েছে। মাঝি আরেকটা বাঁশ নিয়ে সেইখানটা খোঁচাতে, সেই জানোয়ারটা আস্তে আস্তে জলের ওপর উঠে এল। প্রায় জলের ওপর পর্যন্ত উঠে সেটা আবার নীচে বসে গেল। আমরা সকলেই সেটাকে দেখতে পেয়েছিলুম। একটি বিরাট মাছ,—একটু বেঁটে সাইজের কিন্তু ভয়ানক মোটা। কুচকুচে কালো

দেখতে। কি মাছ আমরা বুঝতে পারলুম না। মাছটা বসে যাওয়াতে মামা আবার টানাটানি শুরু করলেন। সেটা কিন্তু উঠছে না। আমি মাঝিকে বললুম, "তুমি আবার বাঁশ দিয়ে ওটাকে খোঁচাও। এবার ব্যাটাকে দেখতে পেলেই গুলি করব। তা নইলে এইভাবে সারা রাত কেটে যাবে।" আমার কথামত মাঝি আবার সেটাকে বাঁশ দিয়ে খোঁচাতে লাগল, এবং সেটা মাটি ছেড়ে আস্তে আস্তে ভেসে উঠল। যখন সেটা চার আঙুল জলের নীচে আছে, তখন আমি L. G. Shot দিয়ে গুলি করলুম। গুলিগুলো লাগল গিয়ে ঘাড়ের নীচে, ঠিক পেটের উপর। মাছটা সঙ্গে সঙ্গে উল্টে গেল এবং আস্তে আস্তে সেটা ডুবে গেল। মাছটা নিশ্চিত মারা পড়েছে জেনে বিজলীর হাতে ছিপ দিয়ে মামা এবং মাঝি দু' জনে জলে নাবলো। দু'জনেই পাকা সাঁতারু—জলের পোকা বললেই হয়। একথা সকলেই জানে যে, জলের ভেতরে দেহের ভার কমই হয়ে থাকে। সেই জন্যে অত ভারী মাছটাকেও তারা দু'জনে তুলে আনতে কষ্ট পেলে না। কষ্ট আরম্ভ হলো সেটাকে নৌকায় তোলবার সময়। সেটা এত ভারী ছিল যে আমরা চার জনে চেষ্টা করেও নৌকোতে তুলতে পারলুম না। তখন সেটাকে বেশ করে দড়ি দিয়ে বেঁধে আমরা নৌকো ছেড়ে দিলুম। দড়ি রইল আমাদের হাতে আর নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে মাছটা চলে আসতে লাগল। মনে অসীম আনন্দ। একটা অদ্ভুত কিছু ধরেছি। এইবার মামার ক্ষিদে চাগাড় দিয়ে উঠল। তিনি পেট ভরে লুচি, আলুর দম ও চা খেলেন। আনন্দে আমাদেরও তখন ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। বিজলী আর আমি সমস্ত খাবার চেঁচে-পুঁছে খেয়ে ফেললুম। সারাদিন দুর্ভোগের পর চাটাও লাগল যেন অমৃত।

যখন ডাঙায় এলুম তখন রাত্তির হয়ে গেছে আর অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। আমরা চার জনে জলে নেবে মাছটাকে টেনে তুললুম। সেই মাছ আমরা গরুর গাড়ী করে বাড়ী আনি। বাড়ীতে এনে

উজ্জ্বল আলোতে যখন মাছটার চেহারা দেখলুম তখন আশ্চর্য হয়ে গেলুম। মাছটা একটি বিরাট কাতলা মাছ, সর্বাঙ্গে বড় বড় শ্যাওলা, আর তাতে বিস্তর পোকা। এ মাছ যে কত পুরনো মাছ তা কেউ বলতে পারে না। আমাদের গ্রামের বৃদ্ধ জেলেরাও বললে এত পুরনো মাছ তারা কখনো দেখেনি। দু'টো বঁড়শিই লেগেছিল মাছটার পেটে। বোধ হয় চারের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তিনি সেখানে বেড়াতে এসেছিলেন এবং তাঁর প্রকাণ্ড দেহের চাপে ফাতনাটা আস্তে আস্তে ডুবে গেছ্‌ল। এ মাছটাকে কখনই রাখা যেত না যদি না বঁড়শি দুটো প্রকাণ্ড হতো। একথা বলাই বাহুল্য যে, আমরা কেউই সে মাছ খাইনি। মামা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্যে 'অমৃতবাজার' হাট থেকে সেই রাত্রেই প্রকাণ্ড গল্‌দা চিংড়ি এনে আমায় খাইয়েছিলেন।

সেদিন আমি আর বিবেকানন্দবাবু (যুগান্তর সম্পাদক) হনলুলুতে একটি অদ্ভুত মাছ দেখেছিলুম। আমরা ২২শে জুন, (১৯৫৭) সানফ্রান্সিসকো থেকে হনলুলুতে আসি। পরদিন আমরা শুনলুম যে, জেলেদের জালে একটা তিমি মাছের বাচ্চা ধরা পড়েছে। আমরা হন্তদন্ত হয়ে দেখতে গেলুম। সেই মাছটাকে জ্যান্ত অবস্থায় কি করে অ্যাকোয়ারিয়ামে (Aquarium) নেওয়া হল সে বলতে অনেক সময় লাগবে। অ্যাকোয়ারিয়ামের বাঁধান পুকুরটি ছিল বেশ বড়। তাতে শীল মাছ ও সিন্ধুঘোটকের মধ্যে সেটাকে ছেড়ে দেওয়া হল। তিমি মাছটা ছিল বার-চোদ্দ হাত লম্বা। আমি আর বিবেকানন্দ গিয়ে দেখলুম যে, অ্যাকোয়ারিয়ামের পরিষ্কার জলে মাছটা চমৎকার সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। আমরা যখন টোকিয়োতে চলে আসি তখনও তিমি মাছটা বেশ ভালই ছিল, আর তাকে দেখতে খুব ভীড় হচ্ছিল। সেটা এখনও বেঁচে আছে কিনা বলতে পারি না।

আমার ভাইপো শ্রীযুক্ত সুনীলকান্তি ঘোষের মৎস্য পালনের খুব ঝোঁক আছে। ইনি আমাদের অমৃতবাজার পত্রিকার সেক্রেটারী এবং

স্বর্গীয় মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। ইনি নানা রকম রঙীন মাছ পুষেছেন এবং তাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি যে শুধু নানা রকমের সুদৃশ্য বিদেশী মাছ পুষেছেন তাই নয় তিনি গঙ্গা থেকে নানা রকমের ছোট মাছ ধরে তাদের পালন করেছেন।

একবার তিনি গঙ্গা থেকে এক অদ্ভুত রকমের চারা মাছ ধরিয়ে আনান। সেই মাছ যখন তাঁর কাছে বড় হচ্ছিল তখন আমরা এ সম্বন্ধে নানা রকম গবেষণা করতুম। আমাদের ঔৎসুক্য কম ছিল না, কারণ এই মাছ ঠিক ইলিশ মাছের মত দেখতে ছিল। যাই হোক শ্রীসুনীলকান্তি ঘোষ এ সম্বন্ধে নিজেই আমাকে যা লিখেছেন তা নিচে প্রকাশ করছি।

শ্রীসুনীলকান্তি ঘোষ লিখেছেন ঃ—"ছেলেবেলা হইতে আমার অভ্যাস যে, যে কোনও কিছু করিতে গেলে তাহার খুঁটিনাটিগুলি দেখা। যখন আমার লাল মাছ পুষিবার শখ হইল তখন কেবল মাছগুলিকে চৌবাচ্চায় ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম না। কি খাবার দিলে মাছগুলি সবল হয় ও তাড়াতাড়ি বাড়ে, মাছের গায়ের রং কি ভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হইতেছে, পেটে যখন ডিম হইল তাহার পর কিভাবে ডিম ছাড়িতে আরম্ভ করিল, ডিমওয়ালা মাছকে অন্য মাছ তখন কি ভাবে তাড়া করিতে লাগিল, সেই ডিম আবার কি ভাবে ফুটিল, বাচ্চাগুলি কি ভাবে চৌবাচ্চার গায়ে আশ্রয় লইল, বড় মাছগুলি তখন কিভাবে তাড়া করিয়া তাহাদের খাইতে লাগিল, অতএব তাহাদের বড় মাছদের আক্রমণ হইতে কি করিয়া বাঁচাইতে হইবে ইত্যাদি অনেক প্রকার খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া খুব ব্যস্ত থাকিতাম।

"লাল মাছ পালন সম্বন্ধে যখন বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম তখন Tropical মাছ পুষিবার শখ হইল। এইজন্য নানা সাইজের Aquarium আনাইয়া তাহাতে Tropical মাছের জোড়া (pair)-

গুলি রাখিতে লাগিলাম। এবং অনেক রকম Tropical মাছের বাচ্চাও তুলিলাম। দেখিলাম ভিন্ন ভিন্ন Tropical মাছের ডিম পাড়া ও বাচ্চা হওয়া পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের।

"এ সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞানলাভ করিবার পর তখন ছোট ছোট আমাদের দেশীয় মাছ পুষিবার শখ হইল। তখন পুকুর হইতে নানা রকম ছোট মাছ যোগাড় করিতে আরম্ভ করিলাম। এবং পুকুরে যত রকম ছোট মাছ জন্মায় তাহাদের মধ্যে অনেক রকমের মাছ সংগ্রহ করিলাম।

"এই সময় আমাদের (Law Department-এর) নীলমণি মিত্র ও তাহার বড় ছেলে অমূল্য—তাহারা রোজ গঙ্গা স্নানে যাইত। নীলমণির নিকট সন্ধান পাইলাম যে, যখন বাজারে মাছের ডিমের আমদানী হয়, সেই সময় গঙ্গাতেও ছাঁকা দিয়া অনেক রকমের ছোট ছোট মাছ পাওয়া যায়। আমি বলিতে নীলমণি খুব উৎসাহের সঙ্গে বাপ ও ছেলেতে মিলিয়া গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া আমাদের বাগবাজারের hanging bridge-এর কাছে ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে একটি বালতি লইয়া যাইত, তাহাতে অল্প জল দিয়া ছাঁকা দিয়া ধরা মাছগুলি আমার নিকট লইয়া আসিত। তখন মাছের জন্য আমিও 'হাঁ করিয়া' বসিয়া থাকিতাম—কখন তাহারা মাছ লইয়া আসিবে। মাছ আনিবার পর আমি বালতি হইতে বাছিয়া বাছিয়া দরকার মত মাছ আমার অফিস-ঘরের কাছে একটি চৌবাচ্চায় ছাড়িয়া দিতাম।

"এইভাবে ঐ চৌবাচ্চা রুই, মৃগেল, কাতলা, কালবাউস, চাঁদা ইত্যাদি অনেক রকম মাছের ছোট ছোট বাচ্চায় ভরিয়া যাইত। এক এক সময় এত বেশী মাছ জমিয়া যাইত যে আমি উহার মধ্য হইতে বাছিয়া অনেক মাছ আমার সিঁথির বাগানের পুকুরে ছাড়িয়া দিতাম। চৌবাচ্চার মাছগুলি তাড়াতাড়ি বাড়িবে ও সুস্থ হইবে বলিয়া আমি daphne পোকা খাইতে দিতাম।

"Daphne পোকার রং একটু গোলাপী বা লালচে। ইহা সাধারণতঃ পচাজল ও গুঁড়িপানাওয়ালা পুকুরে জন্মায়। পোকাগুলি পোস্তদানার অপেক্ষাও ছোট। এক সঙ্গে গাঁদি লাগিয়া পুকুরের কোলে কোলে ঘুরিয়া বেড়ায়। গামছা দিয়া ছাঁকিয়া ইহাদের ধরিতে হয়। বালতি কিংবা ঐরূপ কোনও পাত্রে অল্প জল দিয়া তাহাতে রাখিলে বহুক্ষণ বাঁচিয়া থাকে। ঐ পোকা, মাছ বুঝিয়া, পরিমাণ মত খাইতে দিতে হয়। একটি লোক দাম লইয়া প্রতিদিন আমাকে ঐ পোকা আনিয়া দিত।

"একদিন এইরূপ নীলমণি গঙ্গা হইতে মাছ আনিয়াছে এবং আমি তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া মাছ তুলিতেছি এমন সময় একটি অদ্ভুত রকমের মাছ বা পোকা বালতির মধ্যে দেখিতে পাইলাম। আমি উহা অতি সন্তর্পণে তুলিয়া দেখিলাম যে এটি একেবারে স্বচ্ছ (transparent), খুব সরু, প্রায় দু' ইঞ্চি লম্বা, টোয়াইন সুতাকে চ্যাপটা করিলে যেরূপ চওড়া হয় সেইরূপ চওড়া। ঐটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য চৌবাচ্চায় না ছাড়িয়া আমার একটি ছোট কাঁচের অ্যাকোয়ারিয়ামে ছাড়িয়া দিলাম। ঐ মাছ বা পোকাটি জলের মধ্যে আর দেখা গেল না। Aquarium-এ অন্য কোনও মাছ ছিল না। খুব নজর করিয়া দেখিতে দেখিতে দেখিলাম যে দুটি জ্বলজ্বলে ছোট্ট চোখ জলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কখনও কখনও সম্পূর্ণ মাছ বা পোকাটিকে দেখিতে পাইতেছি। মাছ বা পোকাটি জলের রঙের সঙ্গে এক হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। এই কারণে আমিও নীলমণি ইহার নাম দিয়াছিলাম জল-রঙা মাছ। অনেক চেষ্টা করিয়া নীলমণি গামছা ছাঁকা দিয়া গঙ্গা হইতে পনের-কুড়িটি জল-রঙা মাছ ধরিয়া দিয়াছিল। একটি স্বতন্ত্র Aquarium-এ সেগুলিকে রাখিয়াছিলাম। রোজ daphne খাইতে দিতাম। জল-রঙা মাছগুলি ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল। ঐ সময় তাহাদের অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

"প্রথম দিন যখন জল-রঙা মাছ Aquarium-এ ছাড়িলাম তখন জলের মধ্যে কেবল তাহার চোখ দুটি (বেশ উজ্জ্বল) দেখিতে পাইতেছিলাম। তিনদিন বাদে উহার পেট একটু বড় হওয়ায় পেটের বড় অংশটুকু ও চোখ দুটি নজরে পড়িতেছিল। পাঁচ ছয় দিন পরে সমস্ত মাছটি একটু নজর করিয়া দেখিলেই দেখা যাইতেছিল। ইহার কারণ তখন মাছটি অপেক্ষাকৃত একটু বড় হইয়াছে আর তাহার গা দিয়া ফিকা সবুজ রং-এর আভা দিতেছে। সবুজ রং-এর আভার কারণ হইল, খুব নজর করিয়া দেখিলাম, তাহার গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁশ গজাইয়াছে। এখন মাছটি রোজই একটু একটু করিয়া বড় হইতে লাগিল। লম্বা, চওড়া ও স্থূলতায়ও বাড়িতে লাগিল। গায়ের রং এখন ফিকে সবুজ হইতে ক্রমে সাদা রং-এ পরিণত হইল। এখন মাছটিকে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। দশ-পনের দিন বাদে মাছটিকে খয়রা মাছ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম যে এটি নিশ্চয় খয়রা মাছের বাচ্চা। এই সময় আমার প্রায় পনের-কুড়িটি মাছ হইয়াছে। সুতরাং আমার Aquarium-এ রাখিবার পক্ষে মাছ বেশী হইয়াছে। এখন মাছগুলিকে একটি চৌবাচ্চায় (ইহাতে অন্য কোনও মাছ রাখি নাই) ছাড়িয়া দিলাম এবং নিয়মিত daphne খাওয়াইতে লাগিলাম। চৌবাচ্চাতে তাহারা বেশ বড় হইতে লাগিল। এখন এক একটি মাছ প্রায় আট-দশ ইঞ্চি লম্বা, তিন ইঞ্চি চওড়া ও পিঠের কাছে এক ইঞ্চি মোটা হইয়াছে। তাহাদের এখন আর খয়রা মাছের মত দেখাইতেছে না বরং ইলিশ মাছের বাচ্চা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মাছগুলির চেহারার আর কোনও পরিবর্তন হইল না। কেবল সাইজে সামঞ্জস্য ভাবে বাড়িতে লাগিল। তখন আমার ধারণা হইল যে এগুলি ইলিশ মাছের বাচ্চা। খুব ছোট থেকে এই জলে থাকিয়া acclimatised —অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে। এরূপ ধারণা হইবার একটু কারণও ছিল। শুনিয়াছি যে পূর্ববঙ্গের বরিশাল ইত্যাদি স্থানে নদী ভাসিয়া যখন

আশপাশের পুকুরগুলিতে জল ঢুকিয়া পড়ে সেই সঙ্গে অন্য মাছের সঙ্গে ইলিশ মাছও আসিয়া যায়। সেগুলি পুকুরেই বাড়িতে থাকে এবং জালে ধরা পড়ে। এই বিশ্বাসে সেই সময় আমি অনেককে আমার চৌবাচ্চায় পোষা 'ইলিশ' মাছ দেখাইয়াছি। এবং মনে বেশ গর্বও অনুভব করিয়াছি। মাছগুলি বাড়িতে বাড়িতে এখন প্রায় আধ সের ওজনের হইয়াছে। এত মাছ এখন আর চৌবাচ্চায় রাখা সম্ভব হইল না। সুতরাং মাছগুলিকে ধরিয়া আমার সিঁথির বাগানের ঝিলে ছাড়িয়া দিলাম।

"কিছুদিন বাদে জাল টানাইয়া দেখিলাম যে মাছগুলি আরও বাড়িয়াছে। কিন্তু এই সময় যে জেলেরা জাল টানিতেছিল তাহারা মাছ দেখিয়া বলিল যে ঐ মাছ ইলিশ নয়, উহা অম্‌লেট মাছ। এবং দুই মাছের মধ্যে পার্থক্য কি তাহাও দেখাইয়া দিল।

"অম্‌লেট মাছের আঁশ ইলিশ মাছের আঁশ অপেক্ষা বড় এবং ইহাদের চোখগুলি লাল এবং ইলিশ মাছের চোখ অপেক্ষা বড়।

"একটি মাছ ধরিয়া লইয়া গিয়া রাঁধাইয়া খাইয়া দেখিলাম যে ইহার স্বাদও ইলিশ মাছের মত নয়। বড়ই হতাশ হইলাম।"

সাপের গল্প

বর্ষাকালে পাড়াগাঁয়ে প্রায়ই সাপের উপদ্রবের কথা শোনা যায়, আর সেইজন্য গ্রামের লোকেরা যথাসাধ্য সাবধানে থাকেন। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে তাঁদের কোন হাত নাই এবং সেই কারণে বহু লোক সাপের কামড়ে প্রাণ দেন। পাড়াগাঁয়ে রাস্তায় কোন আলো নেই অথচ তাঁদের অনেক সময় সন্ধ্যার পর রাস্তায় চলতেই হয়। রাস্তার দু'ধারে জঙ্গল। হয়ত একটি বিষাক্ত সাপ রাস্তা পার হচ্ছে, আর ঠিক সেই সময় কোন লোক সেখানে এসে পড়েছেন, এমন কি তার লেজ মাড়িয়ে ধরেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে সে কামড়াবেই এবং তাহলেই মানুষের মৃত্যু। তাছাড়া বৃষ্টি হ'লে সাপ ঘরের ভেতর আসে এবং লুকিয়ে থাকে। গ্রামে তো আর ইলেকট্রিক আলো নেই, মিটমিটে প্রদীপের কি লণ্ঠনের আলোয় খুব অল্পই দেখা যায়। ফলে কোনরূপে সাপের সংস্পর্শে এলেই দংশন ও মৃত্যু। যতদূর জানা গেছে মাত্র দু'রকমের বিষাক্ত সাপই মানুষের সংস্পর্শে এসে থাকতে ভালবাসে —গোখুরা ও কানড় সাপ। কানড় সাপ প্রায়ই মশারীর চাল কিম্বা বিছানায় উঠে আসে। হয়তো নিদ্রিত মানুষের পাশেই পড়ে আছে। হয়তো মানুষটির ভাগ্য ভাল, ঘুমের ঘোরে তিনি তাকে আঘাত করেননি। আঘাত করলেই দংশন, নইলে এই সাপ শুধু শুধু কামড়ায় না। যদিও কানড় সাপের বিষ অপেক্ষাকৃত কমজোর এবং সেইজন্য সময়ে চিকিৎসা হলে অনেক সময়ে মানুষ বেঁচেও যায়, কিন্তু ভয়ের কথা হচ্ছে এই যে, কানড় সাপের কামড়ে জ্বালা-যন্ত্রণা খুব কম হয় এবং ঘুমন্ত মানুষকে কামড়ালে অনেক সময় সে জাগেই না। পরে যখন তার ঘুম ভাঙলো, তখন বিষের ক্রিয়া অনেকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, আর তখন হয়তো চিকিৎসায় কোন ফল হল না।

গোখুরা কামড়ালে ভীষণ যন্ত্রণা হয় এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকলেও তখুনি জেগে ওঠে। কিন্তু এদের বিষ এত তীব্র যে, খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা ক'রতে না পারলে রোগী প্রায়ই মারা যায়। গোখুরা সাপও প্রায়ই আঘাত না পেলে কামড়ায় না। গোখুরা সাপও মানুষের সঙ্গে থাকতে ভালবাসে। সসর্প গৃহে বাস ক'রলে, তা হোক না কেন সে বাস্তু-সাপ, কোনদিন না কোনদিন মানুষের বিপদ অনিবার্য। এক তো আঘাত পেলেই এরা কামড়ায় এবং অন্ধকারে কিম্বা অল্প আলোতে অজ্ঞাতসারে এদের আঘাত দেওয়া মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া শিকার ধরবার সময় সাপেরা প্রায়ই উগ্র হয়ে ওঠে এবং সেই সময় আঘাত না পেলেও তারা মানুষকে দংশন করে।

একবার একটি আট বছরের মেয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে তাদের মাটির দাওয়ায় মাতুর পেতে শুয়েছিল। সেই দাওয়ার একটা গর্ত থেকে হঠাৎ একটা গোখুরা সাপ বেরিয়ে তাকে কামড়ালে। এ ঘটনা আমার চোখের সামনেই ঘটেছিল এবং মেয়েটি তাতেই মারা যায়। ব্যাপারটি হয়েছিল এই ঃ—এই সাপটি সেই মাটির কুটীরেই কোন স্থানে থাকত। সে একটি ইঁতুর দেখতে পেয়ে তাকে তাড়া করে। ইঁতুরটি তার গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সাপও তার পিছু পিছু গিয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকল। ইঁতুরের গর্তটি দেওয়ালে বেশী দূর অবধি ছিল না। সাপকে আসতে দেখে ইঁতুরটি প্রাণভয়ে মাটি কেটে অগ্রসর হ'ল এবং ত্ব' পা দিয়ে মাটি কেটে সাপের চোখে ছিটিয়ে দিয়ে যেতে লাগল। সেইজন্য সাপটি খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে পারছিল না ও ইঁতুরটিকে ধরতে পারেনি। ইঁতুরটি এইভাবে মাটি কেটে দাওয়ায় যেখানে ছোট মেয়েটি শুয়ে ছিল, তার খুব কাছেই একটি খুব ছোট গর্ত ক'রে বেরিয়ে পড়ল এবং নিমিষের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে সাপটিও সেই গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এলো, কিন্তু শিকার না দেখতে পেয়ে ক্ষেপে গেল। সাপটি ফণা তুলে ফোঁস্ ফোঁস্ করছে, এমন

সময় মেয়েটিকে দেখতে পেলে, আর সঙ্গে সঙ্গে ছোবল। এ সাপটাকে আমরা মেরেছিলুম কিন্তু মেয়েটিকে বাঁচাতে পারা যায়নি। তার বুকের কাছে কামড়েছিল বলে কোনও বন্ধন দেওয়া সম্ভবপর হয়নি, আর লোক ডাকতে ডাকতেই মেয়েটি নেতিয়ে পড়ে।

বাড়ী থেকে গোখুরা সাপকে তাড়াবার একমাত্র উপায় হচ্ছে যাতে ইঁদুর না থাকতে পারে তার বন্দোবস্ত করা আর মেটে বাড়ীতে কোন গর্ত থাকতে না দেওয়া। ইঁদুরের খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি হয়, আর তারই এক একটি খেয়ে সাপেরা বেশ বেঁচে থাকতে পারে। এইতো সেদিন, এই কলকাতাতেই, যুগান্তর অফিসের বাড়ীতে একটি লোককে সাপে কামড়েছিল। যুগান্তরের এই বাড়ীর চার পাশেই বহুদিন আগে পুকুর, বাগান ছিল। যখন এই সব জায়গায় নতুন নতুন বাড়ী উঠলো, তখন এই সাপ যুগান্তর বাড়ীর কোন অন্ধকার ঘরের গর্তে বাসা নিয়েছিল। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সে কিম্বা তার সঙ্গীরা শুধু ইঁদুর খেয়েই বেঁচে আছে। শ্রীভগবানের দয়ায় এই লোকটি চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে।

গোখুরা সাপকে আঘাত না করলে তারা কামড়ায় না—এ সম্বন্ধে আমি দু'টি ঘটনার কথা জানি। একটি ঘটনা ঘটেছিল ছোটনাগপুরের কামটা নামক স্থানে। এখানে বছর পনের-ষোলো আগে শ্রীমনোরঞ্জন

কাছে গিয়ে দেখি যে, একটা বড় গোখুরা সাপ একটা গাব গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে মাথা নীচু করে ঝুলছে। আর যখনই শালিক পাখিরা তার কাছে উড়ে আসছে সে মাথা উঁচু করে তাদের কামড়াতে যাচ্ছে। আমরা তখনি বন্দুক দিয়ে সাপটাকে মেরে ফেললুম। ফিঙে যেমন বাজ, চিলের হাত থেকে ছোট পাখীদের রক্ষা করে, শালিক

পাখীও গাছে সাপ দেখলেই তাদের জ্বালাতন করে ও বিকৃত স্বরে ডেকে সকলকে এই শত্রুর উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। দিনের বেলা সাপ পাখীর ডিম, ছানা খেতে গাছে উঠে থাকে। হয়তো বা জমি চষার দরুণ বাসা ভেঙ্গে গেলে বিষাক্ত সাপকে দিনের বেলায়ই বেরিয়ে আসতে হয়, আর তখনি শালিক পাখীরা তার পেছনে লাগে। কুকুররাও সাপ দেখলে ডাকতে থাকে।

সাপেরাও তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি (instinct) বলে বেশ জানে যে, দিনের বেলায় দর্শন দেওয়া এদের পক্ষে নিরাপদ নয়। মানুষ তো তাদের দেখলেই মারবে; তা'ছাড়া অন্যান্য শত্রুও এদের অনেক আছে। এইসব শত্রুদের কথা পরে বলব। এমন কি হনুমানরাও সাপকে রেহাই দেয় না।

একবার হনুমানের সঙ্গে সাপের লড়াই দেখবার সৌভাগ্য আমার

হ'য়েছিল। তখন নতুন লক্ষ্মীকান্তপুরের লাইন খুলছে। সেই সময় যখন জয়নগর-মজিলপুর ষ্টেশন তৈরি হচ্ছিল তখন এই ঘটনা ঘটে। তখন বেলা দশটা, নতুন ষ্টেশনের খুব কাছেই দেখলুম কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে কি দেখছে। আমি নিকটে গিয়ে দেখি নীচে জলা মত একটা জায়গায় দু'পাশে দুটো হনুমান আর মাঝখানে সামান্য একটু জঙ্গলে একটা কালো বড় কেউটে সাপ। তখনও কোন যুদ্ধ আরম্ভ হয়নি। আমি গিয়ে দেখলুম যে, সাপটা হনুমান দু'টোকে দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে ফণা তুলছে। হনুমান দু'টো সাপের মাথা ও লাজের দু'দিকে আছে, কিন্তু এমন জায়গায় রয়েছে যে, সাপটা সহজে তাদের নাগাল না পায়। সাপটা ফণা তুলে এদিক ওদিক দেখছে, ক্রমে একদিকে ঘুরল। তখন তার মুখ হয়েছে একটা হনুমানের দিকে আর লেজ অপর দিকে। সাপ ফণা তুলে মাথাটা অল্প অল্প দোলাতে লাগল, তারপর হঠাৎ তীরবেগে সামনের হনুমানটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ছোবল মারলে। হনুমানটা ঠিক সেই সময় দু'পা পেছিয়ে গেল আর সাপের ছোবলটা গিয়ে পড়ল আগাছার জঙ্গলের ওপর। আমি চমৎকৃত হয়ে দেখলুম যে, অপর হনুমানটা সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে সাপের লেজটা ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলে। সাপটা তৎক্ষণাৎ ফণা তুলে সেই হনুমানটার দিকে ফিরল; সে কিন্তু টান মেরেই লেজ ছেড়ে দিয়েছে এবং তিন-চার হাত দূরে সরে গিয়েছে। হ্যাঁচকা টান খেয়ে সাপটা ভীষণ রেগে গিয়েছে এবং মাথা দোলাতে দোলাতে ভীষণ গর্জন করতে লাগল। একটু বাদেই সে তীর বেগে সামনের হনুমানটাকে ছোবল মারলে কিন্তু হনুমানটা ক্ষিপ্র বেগে সরে যাওয়াতে সে ছোবল তার গায়ে লাগল না। ছোবল মেরেই সাপটা ফণা তোলবার আগেই অপর হনুমানটা বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে এসে তার লেজটা ধরে ফেললে এবং সজোরে এক টান মারলে। পরের ঘটনা বিস্তারিত বলবার আর আবশ্যক নেই। সাপটা একবার

এদিকে একবার ওদিকে বার বার ছোবল মারতে লাগল কিন্তু একবারও একটা হনুমানকে ছুঁতে পারলে না। সাপটা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল আর হনুমান দু'টোও ক্রমেই আরও কাছে এসে বসতে লাগল। বার বার বিফল হয়ে সাপটার তখন চেষ্টা হচ্ছে পালাবার, কিন্তু সে হয়ে গেছে তখন দুর্বল,

আর হনুমানরা লেজ ধরে ঘন ঘন টানছে। আমরা বহুলোক চিত্রার্পিতের ন্যায় উঁচু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এই ঘটনা দেখছি। তারপর হঠাৎ কি হল বুঝতে পারলুম না, দেখলুম একটা হনুমান হাত দিয়ে সাপের ফণাটা চেপে ধরেছে আর অপরটা তার মাজা আর লেজ চেপে ধরেছে। সাপটা তার শরীরে ভীষণ মোচড় দিতে লাগলো, যাতে হনুমানদের হাত থেকে তার দেহটা ছাড়িয়ে নিতে পারে, কিন্তু হনুমানেরা তাকে ছাড়লে না। একটু বাদেই হনুমান দু'টো সাপটাকে সেই অবস্থায় ধরেই কেমন এক রকম ডাকতে ডাকতে একটা গাছের ওপর উঠে গেল। গাছে উঠেই এক ভীষণ চিৎকার; তারপরই আমরা দেখলুম যে, যে হনুমানটা সাপের মাথাটা ধরেছিল সে সেই ফণা ধরে গাছের ওপর রগড়াতে লাগল। অন্য হনুমানটা কিন্তু সাপের লেজ ও কোমর একই ভাবে ধরে আছে আর তার শরীরটা টান টান

করে রেখেছে—যাতে সে জড়াতে না পারে। হনুমানটা সাপের ফণা ঘষছে তো ঘষছেই। সাপ মরে গেছে তবু ঘষার বিরাম নেই। এই সময়ে হনুমান দু'টোর ভেতরে চোখে চোখে কি কথা হল, তার পরেই তারা ঠিক এক সঙ্গে সাপটাকে ধান ক্ষেতের দিকে ছুড়ে ফেলে দিলে। আমরা কাছে গিয়ে দেখি সাপটার মাথার আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। যা আছে তা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড মাত্র। এই সাপটা ছিল ধান বনের কেউটে। কোনও কারণ বশতঃ দিনের বেলায় সে তার বাসস্থান থেকে বেরিয়ে এসে দেখা দেয়। তার ফলে হল তার মৃত্যু। হনুমান দু'টো বোধ হয় গাছের ওপর থেকে সাপটাকে দেখতে পেয়েছিল। তার পরেই তারা গাছ থেকে লাফ দিয়ে নেমে সাপটার দু'দিকে দু'জনে বসে।

সাপেদের শত্রুর মধ্যে বেজীকেই প্রধান বলে ধরা হয়েছে। তার কারণ এই যে, শাপে নেউলে চিরশত্রুতা। দেখা হলেই যুদ্ধ —আর এ যুদ্ধ অনেকটা সমান সমান বলেই খুব চিত্তাকর্ষক। বেজী ক্ষিপ্র বলে তার আক্রমণ করার ক্ষমতা বেশী এবং এই জন্য সে প্রায়ই জেতে। কিন্তু সাপেরও ব্রহ্মাস্ত্র আছে। সে যদি একবার কামড়াতে পারে তাহলেই বেজীর মরণ। লোকের মনে বিশ্বাস আছে যে, বেজী সাপের ওষুধ জানে, তা বোধ হয় ঠিক নয়—অন্ততঃ সব বেজী যে ওষুধ জানে না একথা নিশ্চয়ই ঠিক। আমার সামনে আমি বেজীকে সাপের কামড়ে মরতে দেখেছি। একবার আমাদের দেশে একটা পুকুরের ধারের জঙ্গলে দু'টো গোখুরা সাপের খেলা দেখছিলুম। তারা দু'টোতে জড়াজড়ি করে উঁচু হয়ে উঠছে আবার নেমে যাচ্ছে। সাপের এই মিলনকে লোকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে এবং এই প্রবাদ আছে যে যদি কোন বস্ত্র সাপ দু'টোকে স্পর্শ করান যায়, তবে ওই বস্ত্র সৌভাগ্য আনয়ন করে। আমরা, যারা দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, ভাবছিলুম যে একটা কাপড় সাপেদের গায় ফেলে দেব এবং সাপ দু'টো চলে

গেলে ও বস্ত্রটি উঠিয়ে নেব। এমন সময় দেখলুম যে, একটা বেজী এসে উপস্থিত হল। বেজীকে দেখেই সাপ দু'টো দু'দিকে সরে গেল। সাপদের পালাবার চেষ্টা, কিন্তু বেজী পালাতে দেবে না। সাপেরা প্রাণের দায়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। সাপ দু'টো দু'দিকে থাকাতে বেজীর মুশকিল হচ্ছে। একটাকে আক্রমণ করতে গেলে অপরটার দিকে পেছন ফিরতে হয়। ঠিক দুই হনুমান ও এক সাপের যুদ্ধের মত। এরূপ ক্ষেত্রে বেজীরা প্রায়ই লড়াই করে না। কিন্তু এই বেজীটা যুদ্ধ করলে এই যুদ্ধ বিশেষভাবে বর্ণনা করবার
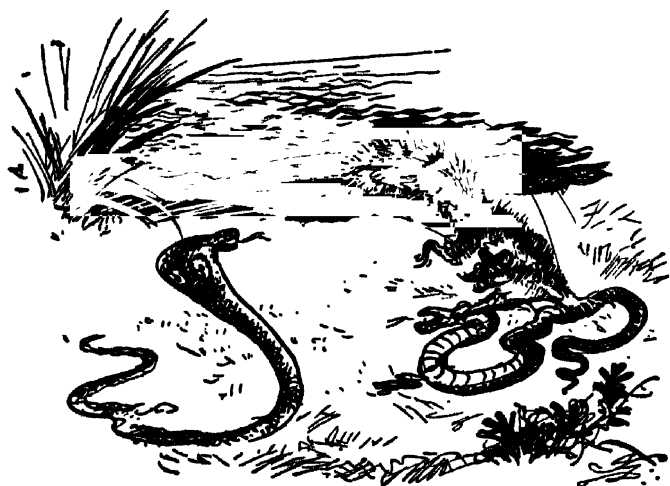
দরকার নাই। বার বার আক্রমণ করে বেজীটা দু'টো সাপকেই অল্পবিস্তর আঘাত করল। একটা সাপ ত মরেই গেল। কিন্তু মরবার আগে এই সাপটা একটা ছোবল বেজীটার পায়ে লাগাতে পেরেছিল। তৎক্ষণাৎ বেজীটা একটু দূরে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বসল ও তার ক্ষতটা চাটতে লাগল। বোধ হয় চুষে বিষটা তুলে ফেলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আমরা কাছে গিয়ে দেখি যে, বেজীটা মরে গেছে। যে সাপটা বেঁচেছিল, সেও খুব আঘাত

পেয়েছিল। সে মৃত সঙ্গীকে ফেলে আস্তে আস্তে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। সে পরে মরেছিল কি না আমি জানি না।

সাপের আর এক ভীষণ শত্রু হচ্ছে গোসাপ (iguana)। এদের সঙ্গে সাপের ঠিক লড়াই হয় না, যেমন বেজীর সঙ্গে হয়ে থাকে। সাপ এদের খাদ্য এবং এই জন্য এরা দেখা হলেই সাপ মারে না। বেজীতেও সাপ খেয়ে থাকে বটে কিন্তু শুধু খাবার জন্যেই যে তারা সাপ মারে তা ঠিক নয়। খিদে পাক বা না পাক, সাপ দেখলেই বেজী আক্রমণ করে থাকে। অধিকাংশ সময়ে সাপকে মেরে কিম্বা তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় রেখে চলে যায়। অবশ্য আমরা বেজীকে সাপ খেতেও দেখেছি। আমাদের কলকাতার বাড়ীর বাগানে ছোট ছোট ঢোঁড়াসাপ বেজীতে প্রায়ই আহার করত। কিন্তু বেজীর সাপ মারা অনেকটা বংশগত শত্রুতার সামিল। আর এ যুদ্ধ অনেকটা সমানে সমানে। কিন্তু গোসাপের সঙ্গে সাপের লড়াই যুদ্ধই নয়; কারণ এই যুদ্ধে গোসাপের কিছুমাত্র বিপদ নেই এবং প্রতিবারই সাপের পরাজয় হয়—অর্থাৎ মৃত্যু হয়। এই সম্বন্ধে একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সেই সময় আমি দিন কতকের জন্যে মহিষাদলের নিকটবর্তী মধ্যহিংলি গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে মিত্রবাবুরা জমিদার ছিলেন। আমি নরেনবাবুর (এখন স্বর্গীয়) বাড়ী অতিথি হয়েছিলুম। তাঁদের প্রকাণ্ড পুরোন বাড়ী। একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে একতলায় গোলমাল শুনে আমি ব্যাপারটা দেখতে গেলুম। একতলায় নরেন-বাবুদের ঘুঁটে-কয়লা ও অন্যান্য জঞ্জাল রাখবার একটি ঘর ছিল। গোলমালটা সেই ঘরের কাছ থেকেই আসছিল। নরেনবাবুর চাকর ভরত মান্না চিৎকার করে বলছিল, “সরে যাও, সরে যাও, বড় সাপ” এই ঘুঁটের ঘরে একটি মাত্র ছোট জানালা ছিল, তাতে কাঠের গরাদে দেওয়া। এই জানালাটি বাড়ীর পেছনদিকে ছিল। সেইদিকে কিছু জঙ্গল ও একটু দূরেই বাড়ীর খিড়কির পুকুর, যেটা আসলে ছিল পানা ও ঝাঁঝির জঙ্গলে ভরা একটি ডোবা মাত্র। ভরত মান্না এই জানলার

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল। আমি আর নরেনবাবু তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দেখি জানালার ঠিক নিচেই একটি প্রকাণ্ড বড় ধূসর বর্ণ 'খোয়ে গোখুরা' সাপ। এই জাতীয় সাপকে বেহারে বলে 'আধসর'। এদের জন্ম হয় ঢ্যামন পুরুষ ও মেয়ে গোখুরার সংযোগে। এরা সাধারণ গোখুরার চেয়ে আকারে বড় ও অধিক বলশালী হয়। এদের বিষও অনেক বেশী। ভরত ছিল সাপ মারবার ওস্তাদ। এর কিছুদিন আগেই সে ওই সাপের জোড়াটিকে মেরেছিল। আজকে ঘুঁটে বার করতে গিয়ে এই সাপটাকে দেখতে পায় এবং তাড়াহুড়ো করাতে সাপটি জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ভরতের হাতে লাঠি। আর সে প্ল্যান করছে কি করে সাপটিকে আঘাত করবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, সাপটা জানলার দিকে পেছন করে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। যাকে সাপের 'কোণ নেওয়া' বলে তাই হয়েছে। তার কাছে যাওয়া মুশকিল। এবং এটা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে যে, সাপে যখন ছোবল মারে তখন সে যতটা ফণা উঁচু করে আছে তার ডবল দূরে আঘাত করতে পারে। আমরা সাপটার দশ-বারো হাত দূরে দাঁড়িয়ে গবেষণা করছি; এমন সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। একটা খড়মড় শব্দ শুনে চেয়ে দেখি যে, একটা গোসাপ সেই পানা-পুকুরটার পাড় দিয়ে হন্ হন্ করে উঠে আসছে। আমরা যে এত লোক এখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেদিকে সে দৃক্‌পাত করলে না। যেন সে কত ব্যস্ত। যেন তার হাতে একটুও সময় নেই। এমনিভাবে সে হন্তদন্ত হয়ে এসে সটান সাপটার কাছে চলে গেল, এবং সাপটার লেজটা কামড়ে ধরে খেতে সুরু করলে। সাপটা এইভাবে আক্রান্ত হয়ে বার বার তার পিঠে ছোবল মারতে লাগল। কিন্তু গো-সাপের গ্রাহ্যই নেই। তিনি এক মনেই আহার কার্যে রত আছেন। যেন তাঁর দরকারী এন্‌গেজমেণ্ট আছে। তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়েই তাঁকে ছুটতে হবে, এইভাবে। তিনি সাপটাকে লেজের দিক থেকে খেয়ে যাচ্ছেন আর সাপটা তাঁকে

বার বার কামড়াচ্ছে। গোসাপের কোনও চিন্তা নেই—কারণ তাঁর পিঠে বর্ম আঁটা। মহাবীর কর্ণের মত কবচ (অবশ্য কুণ্ডল নহে) নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। সাপের ছোবলে সাপেরই অনিষ্ট হচ্ছে। গোসাপের পিঠের শক্ত কাঁটায় লেগে সাপের ফণা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। আর সেখানে বিষদাঁত বসান দূরে থাকুক, আমার মনে হল সাপের দু-একটা দাঁতও ভেঙ্গে গিয়েছে। অতি শীঘ্রই এই

একতরফা যুদ্ধের শেষ হয়ে গেল। প্রায় এক হাত পরিমাণ সর্প লেজ উদরস্থ করে গোসাপ খুব ব্যস্ত-সমস্তভাবে খড়মড় করতে করতে তাঁর ডোবায় ফিরে গেলেন। আর সাপটা তার লেজের ও মুখের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে লাগলো। এই সময় ভরত মান্না গিয়ে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারলে। আরও একবার আমি গোসাপ-সাপের 'লড়াই' দেখেছিলুম। সেবারে সাপটা ছিল মাঝারি সাইজের একটি জল-ঢোঁড়া সাপ। গোসাপ আমার সামনেই প্রায় সমস্ত সাপটাকে খেয়ে ফেলেছিল।

বেজী কি গোসাপ, এসব দেখলেই সাপের অত্যন্ত ভয় হয়। কিন্তু তারা সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় পায় হাড়গিলে পাখীকে দেখে। সর্বরকম সাপ হাড়গিলের খাদ্য, কিন্তু সে গোসাপের মত অল্পে সন্তুষ্ট নয়। অবশ্য

গিয়েছিলুম। সেই বাগানে 'সেক্রেটারী বার্ড' বলে এক রকম পাখি দেখলুম। তারাও নাকি সাপ দেখলেই মেরে ফেলে।

এতক্ষণ সাপের পরাজয়ের কথা লিখলুম। এইবার তাদের সাহস ও আক্রমণের দুইটি ঘটনা বর্ণনা করছি। আমার যতদূর জানা আছে, তাতে অধিকাংশ বিষাক্ত সাপই মানুষকে ভয় করে এবং বেকায়দায় না পড়লে আক্রমণ করে না। কিন্তু কয় জাতীয় বড় ফণাধারী সাপ, যাদের ইংরাজিতে King Cobra বলে, তারা মানুষকে ভয় তো পায়ই না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকারণেই আক্রমণ করে থাকে। এই সব সাপ দুধরাজ, পাতরাজ, শঙ্খচূড়, কালকেউটে প্রভৃতি। আমার এক আত্মীয় উত্তর ভাগলপুরের কোনও গ্রামে বাস করতেন ও সেখানে ডাক্তারী করে জীবিকানির্বাহ করতেন। তাঁর একটি চমৎকার ভুটিয়া ঘোড়া ছিল। তাইতে চেপে তিনি গ্রামে গ্রামে রোগী দেখে বেড়াতেন। একবার তিনি একটি গ্রামে রোগী দেখতে গেছেন, সেখানে পাশের গ্রাম থেকে একটা লোক এসে তাঁকে আর একটি রোগী দেখবার জন্য আহ্বান করলে। এই দুই গ্রামের মধ্যে একটি বড় মাঠ ছিল। যে লোকটি তাঁকে ডাকতে এসেছিল, সে তাঁকে মাঠের বাইরে দিয়ে এক রাস্তায় তাদের গ্রামে নিয়ে গেল। এইখানে রোগী দেখে তাঁকে পূর্বোক্ত রোগীর বাড়ীই ফিরে যেতে হবে, এইরূপ কথা ছিল। তিনি নতুন রোগীকে ওষুধ দিয়ে পূর্ব গ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। যে লোকটি তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল সে অনাবশ্যকবোধে এবার আর তাঁর সঙ্গে গেল না। তিনি কিন্তু রাস্তা দিয়ে মাঠের ধারে এসে মনে করলেন "এতটা পথ ঘুরে যাওয়ার আবশ্যক কি? ওই তো মাঠের ওপারে সেই গ্রাম দেখা যাচ্ছে। আমি কেন মাঠের ভিতর দিয়ে চলে যাই না। যদিও মাঠে বড় বড় ঘাস হয়ে আছে কিন্তু তাতে আমার অসুবিধেটা কি? আমি তো ঘোড়ায় চড়ে যাব।" এই মনে করে ডাক্তারবাবু ঘোড়া নিয়ে মাঠের মধ্যে নামলেন। একটুখানি গিয়েই তাঁর সঙ্গে চার

পাঁচজন চাষীর সাক্ষাৎ হল। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, প্রত্যেকের হাতে চার-পাঁচটি করে ছোট লাঠি রয়েছে। ডাক্তারবাবুকে মাঠের দিকে যেতে দেখে চাষীরা বললে, "এই, আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?" (অবশ্য তারা হিন্দীতেই বলেছিল, আমি বাংলায় বলছি)। ডাক্তারবাবু বললেন, "আমি মাঠের ভেতর দিয়ে ঐ গ্রামে যাব।" চাষীরা বললে, "খবরদার, এমন কাজ করবেন না। এই মাঠে এক ভারি দরাদ (বড় কেউটে সাপ) আছে। সে মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে। আমরা ক্ষেতে কাজ করি আর সঙ্গে এই সব লাঠি রাখি। সে বেটা আমাদের দিকে তেড়ে এলেই, আমরা দূর থেকে এই লাঠি ছুঁড়তে আরম্ভ করি। লাঠির ভয়ে সে কাছে আসতে পারে না; দূরে সরে যায়। বাবু, আপনি এ রাস্তায় যাবেন না।" আমার সেই আত্মীয় ডাক্তারবাবু গোঁয়ার গোছের লোক ছিলেন। তিনি ভাবলেন "হ্যাঁঃ, আমি থাকবো ঘোড়ায়, সে দরাদ তো আমার সব করবে।" এই বলে তিনি চাষীদের কথা গ্রাহ্য না করে মাঠের পথে এগিয়ে চললেন। তিনি যেতে যেতে পেছনে শুনতে পেলেন চাষীরা বলছে, "এ বাঙ্গালী তো বহুত বোকা আছে। আমাদের বাত শুনলে না। বহুত মুশকিল মে গিরবে।"

ডাক্তারবাবু এগিয়ে চলেছেন আর সাপের কথা ভাবছেন। খানিক দূর যাবার পর তিনি পেছনে একটা হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি পেছন ফিরে দেখেন, একটা প্রকাণ্ড কেউটে সাপ (বোধ হয় পাতরাজ সাপ) কুলোর মতন ফণা তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছে। মাত্র লেজের কাছে অল্প একটু দেহ মাটীতে আছে আর বাকি সবটাই শূন্যে। মনে হচ্ছে যেন সে লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই সে মাথাটা নামিয়ে নিলে এবং গর্জন করতে করতে সবেগে ডাক্তারবাবুকে তাড়া করলে। সাপের ভীষণ মূর্তি দেখে ডাক্তারবাবুর প্রাণ উড়ে গেছে। তিনি ঘোড়ার পেটে পায়ের ঠোক্কর দিতে দিতে চাবুক মেরে সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

তিনি যাচ্ছেন কিন্তু বেশ জানেন সাপটা পেছনে আসছে, কারণ তার হিস্ হিস্ গর্জন সমানে শোনা যাচ্ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে পেছন ফিরে দেখছিলেন যে তাঁর ঘোড়ার সঙ্গে সাপের দূরত্ব প্রায় একই রকম আছে। এইভাবে প্রাণ হাতে করে প্রাণপণে প্রায় আধ মাইল দৌড়ে মাঠের শেষে এসে পড়লেন। সেখানে ছিল একটা ছোট নদী—সাত আট হাত চওড়া কিন্তু গভীর খুব। ডাক্তারবাবু প্রাণের দায়ে ঘোড়া নিয়ে নদীর ওপারে লাফিয়ে গেলেন। ঘোড়া নদী পার হল বটে, কিন্তু সামলাতে পারলে না। ঘোড়াটা ওপারে

পৌঁছেই সজোরে পড়ে গেল। আর ডাক্তারবাবুও দূরে ছিটকে পড়লেন। ঘোড়া এবং ডাক্তারবাবু হু'জনই খুব আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবুর মনে তখন সাপের ভয়ই প্রবল। তিনি পেছন ফিরে কিন্তু সাপটাকে আর দেখতে পেলেন না। যদি নদীতে নেবে থাকে এই মনে করে তিনি নীচে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন যে, তাঁর অনুমানই ঠিক। সেই বিরাট সাপ নদীর নীচে গিয়ে পড়েছে এবং

বোধ হয় আঘাতও পেয়েছে। কারণ, সাপটা নদীর জলের ধারেতে অল্প ফণা তুলে কেবল ঘুরছিল। সেই নদীর পাড়ে চষা ক্ষেতে অনেক বড় বড় মাটির ঢেলা ছিল। ডাক্তারবাবু সেই ঢেলা তুলে সাপটাকে মারতে লাগলেন। তু'একবার ফসকে গেলেও একটি বড় ঢেলা ঠিক সাপের পিঠের ওপর গিয়ে পড়ল এবং তার কোমরটা ভেঙ্গে গেল। এতবড় শত্রুকে বাগে পেয়ে তিনি ছেড়ে কথা কইলেন না। তিনি ইট-পাটকেল যা সামনে পেলেন তাই ছুড়ে ছুড়ে সাপের ওপর ফেলতে লাগলেন। বলা-বাহুল্য বহুবার আঘাত পেয়ে সেই বিরাট সাপ মৃত্যুবরণ করলে। ডাক্তারবাবু এবং ঘোড়া তু'জনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গ্রামে ফিরে গেলেন এবং রোগীর বাড়ীর লোকেদের এই ঘটনার কথা জানালেন। সেই দিনই ডাক্তারবাবু অন্য ঘোড়ায় ক'রে পাঁচ মাইল দূরে নিজের গ্রামে ফিরে গেলেন।

এই ঘটনার একটি ছোট উপসংহার আছে। ঐ ক্ষেতের চাষীরা যখন শুনলে যে, ডাক্তারবাবু তাদের বিরাট শত্রু নিপাত করেছেন, তখন তারা তাঁর ঠিকানা খুঁজে বার ক'রে তাঁর বাড়ীতে এসে সেই 'বোকা বাঙ্গালীকে' একটি তুধওয়ালা ছাগল উপহার দিয়েছিল।

এইবার ছোট সাপের রাগের কথা বলব। এই সাপটি লাউডগা জাতীয় কোন সাপ। আমাদের একটি চাকর আমাদের গ্রামের পুকুরে—কলা গাছের ভেলায় উঠে মাছ ধরছিল। তার একটি সাত আট বছরের ছোট মেয়ে পুকুর ঘাটে তার বাপের কাছে যাচ্ছিল। এই সাপটা একটা বড় গাছের ওপর থেকে হঠাৎ কেমন করে জানিনা রাস্তার ওপর পড়ল ও বেশ বড় আঘাত পেল। আঘাত পেয়েই তার রাগ হয় এবং সামনে মেয়েটিকে আসতে দেখে তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে তাড়া করে। মেয়েটি বাবা, বাবা, বলে ডাকতে ডাকতে পুকুরের দিকে দৌড়াল। সাপও পেছনে পেছনে তেড়ে আসতে লাগলো। মেয়েটি দৌড়ে ঘাটে এসে ঝপাং করে জলে পড়ল এবং

সাঁতরে বাপের ভেলার দিকে যেতে লাগলো। সাপটা হয়তো মনে করেছিল, তার আঘাতের জন্য ঐ মেয়েটাই দায়ী। সেইজন্য তার ওপর তার ভীষণ রাগ। সাপটাও জলে নেমে তার পেছনে পেছনে সাঁতরে যেতে লাগলো। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলে সে ভালই সাঁতার জানতো। সে কাছে আসতেই তার বাপ তাকে ভেলার ওপর টেনে তুলে নিল। কিন্তু এইটুকু সাপের কি বিক্রম! সে কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে সটান ভেলার দিকে এগিয়ে এলো। আমাদের চাকরটার হাতে ছিল এক লাঠি। সে দু'তিন আঘাতে সাপটাকে মেরে ফেললে।

অনেক সময় মানুষ সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে বেঁচে যায়। আমাদের এলাহাবাদ অফিসের ভোলাবাবু, মাত্র কয়েক দিন আগে, বিন্ধ্যাচলে, পাহাড়ের ওপর জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। তিনি একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর চার পাশে অনেক বড় বড় পাথর পড়ে আছে। হঠাৎ তাঁর ঠিক পাশ থেকে একটা প্রকাণ্ড ফণাধারী সাপ গর্ত থেকে হুস্ করে মাথা উঁচু করে উঠলো তাঁর এক হাতের মধ্যেই। ভোলাবাবু নড়ন-চড়ন রহিত, কারণ নড়লেই কামড়াবে। যদিও সাপটা গর্জন করছিল, সে কিন্তু ভোলাবাবুকে কিছু বললে না। দু'এক সেকেণ্ডের মধ্যে সে মাথাটা নীচু করে গর্তের মধ্যে টেনে নিলে। একেই বলে রাখে কৃষ্ণ মারে কে? কারণ ইচ্ছে করলেই সাপটা কামড়াতে পারত—এত কাছে সে ছিল।

আবার যার মৃত্যু লেখা আছে, তার মরণ হবেই। এই সেদিন সন্ধ্যার সময় হরবিলাস নাথ বলে একজন লোক সাইকেলে করে ২৪-পরগণা, হাবড়া থানার অন্তঃপাতী জয়গাছি গ্রামে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সাইকেলের চেন ছিঁড়ে যায়। তাতে বাধ্য হয়ে তাঁকে সাইকেল থেকে নেমে পড়তে হয়। তিনি যেখানে নামলেন সেইখানেই একটি বিষাক্ত সাপ শুয়ে ছিল। আর তাঁর এমনি দুর্ভাগ্য যে, তিনি

নামলেন সেই সাপেরই ওপরে। সাপটি তক্ষনি তাঁকে দংশন করলে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি বাঁচেননি। হরবিলাস মাত্র এক বছর আগে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর বয়স চোদ্দ বছর মাত্র। তাঁর পিতামাতা ও স্ত্রীর নিদারুণ শোকের বর্ণনা করা যায় না। এই সংবাদ খবরের কাগজে বের হয়েছিল।

পাকিস্তান হবার আগে আমাদের অমৃতবাজার গ্রামের দশ মাইল দূরে সুখপুকুর গ্রামে একটি চাষী যুবক ক্ষেতে কাজ করছিল। একটি আলের ওপর থেকে হঠাৎ একটা কেউটে সাপে তার আঙুলে কামড়ে দেয়। ছেলেটির অশেষ মনের জোর ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে দিয়ে তার আঙুলটি ছেদন করে ফেলে এবং বাড়ী

চলে আসে। চার পাঁচদিন চিকিৎসা করার পর তার আঙুলের ঘা অনেকটা সেরে আসে। একদিন সে ভাবলে যে, সে ক্ষেতে গিয়ে সেই কেউটেটাকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করবে এবং তাকে তার প্রতিফল দেবে। সেখানে গিয়ে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো যে কোথায় কেউটের গর্ত। এইরূপে খুঁজতে খুঁজতে সে হঠাৎ দেখতে পেল যে, তার কাটা আঙুলটা এক স্থানে পড়ে আছে। আঙুলটা দেখে তার মনে এক অনির্বচনীয় ভাব হল। সে সেই আঙুলটি তুলে

নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর তার কি মনে হওয়াতে সেই আঙুলটি তার কাটা আঙুলটির জায়গায় লাগিয়ে ভাবতে লাগলে "ঠিক এই জায়গায় আমার আঙুলটি ছিল।" এর খানিকক্ষণ বাদেই তার শরীর কেমন করতে থাকায় সে তাড়াতাড়ি চলে আসে এবং বাড়ীর লোকদের সব কথা বলে। তখনি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু কাটা আঙুলের বিষ তার রক্তের সঙ্গে মিশে যাওয়াতে ছেলেটিকে বাঁচাতে পারা যায়নি। একেই বলে মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?

সর্প দংশনে যে প্রায়ই মৃত্যু হয় তার আসল কারণ এই যে, বিষ যত তাড়াতাড়ি সংহার করে ওষুধ তত ত্বরিত গতিতে কার্য করে না। অনেক সময় চিকিৎসা শুরু করবার আগেই অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। সর্প দংশনের অনেক রকম চিকিৎসার কথা শোনা যায় এবং কোন কোন চিকিৎসা প্রণালী সময়ে প্রয়োগ করতে পারলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। আমার স্বর্গীয় পিতা এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করে বহুদিন আগে একখানি বই লিখেছিলেন। তাতে সাপের কামড়ের সহজ সরল চিকিৎসা পদ্ধতির কথা লেখা আছে।

আমাদের দেশে প্রথা আছে যে, সর্প দংশনে মৃত লোককে দাহ করতে নেই। এরকম মৃতদেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়াই নিয়ম। এই জন্যেই বেহুলা লখীন্দরের দেহ নিয়ে ভেলায় করে জলে ভেসেছিলেন। অবশ্য একেবারে মরে গেলে কেউই বাঁচাতে পারে না। তবে অনেক সময় বাহ্যতঃ রোগী সম্পূর্ণ মৃত বলে মনে হয় যদিও এই সব রোগী মরেনি ; কেবল বিষের ঘোরে এমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, তাদের দেহে জীবনের কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না। এই সব 'মৃত' লোক কদাচিৎ রক্ষা পেয়েও থাকে আর এদের একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে জল। লোকে যখন সাপের কামড়ে মরা লোকের দেহ জলে ভাসিয়ে দেয় তখন মনের অভ্যন্তরে একটু ক্ষীণ আশা থাকে—হয়তো এ কোন রকমে বেঁচে গেলেও যেতে পারে। এই সব

'মৃত' রোগীর 'জলসায়' বলে এক রকম চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। আমার বাবার লেখা বই "সর্পাঘাতের চিকিৎসা" থেকে এই সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে এই প্রবন্ধ শেষ করব। বাবার এই বইটির কথা আজকাল অনেকে না জানলেও, এককালে এর বহুল প্রচার ছিল। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালে। এর একটি ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। ঘটনাটি এই :—

"সে আজ কুড়ি বৎসরের কথা। একদিন আমরা কয়েকজন খুলনা জেলার মধ্যে মহকুমা বাগেরহাটের নদীর ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছি। বেলা তখন ন'টা হইবে। দেখি, ঘাটের পার্শ্বে কতকগুলি লোক জমা হইয়াছে। কিছু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমরা সেখানে গেলাম। যাইয়া দেখি, মাটিতে একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে, আর তিন-চার জন লোক তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ইহাদের নিকট মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, 'আমাদের বাড়ী এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে। কাল রাত্রে ইহাকে সাপে কাটিয়াছিল। কত রোজা দেখাইলাম, কত চিকিৎসা করিলাম কিছুতেই আরাম হইল না, শেষ রাত্রে মরিয়াছে। গ্রামের চৌকিদার বলিল, কোম্পানীর হুকুম আছে, সাপে কাটিলে সরকারী ডাক্তার পরীক্ষা না করিলে লাশ জ্বালান যায় না। তাই ডাক্তারকে দেখাইতে এখানে আনিয়াছি।'

আমাদের সঙ্গে মুন্সেফি আদালতের একটি আমলা ছিলেন। তিনি ঐ কথা শুনিয়া মৃতদেহের নিকট যাইয়া বসিলেন ও তাহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিয়া উঠিলেন, 'আমি ইহাকে বাঁচাইব।' আমরা তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলাম। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন, 'আমোদ নহে, আমি উহাকে নিশ্চয়ই আরাম করিব।' ইহাই বলিয়া তিনি কয়েকটি কলসী ও কলার একটি মোচা আনিতে বলিলেন। তখনই তাঁহার ফরমাইস মত জিনিস আনা হইল। তিনি মোচার উপরিভাগ গোল করিয়া কাটিয়া

লইলেন। তখন মৃতদেহকে একজন ধরিয়া বসিল, আর তিনি তাহার তালুতে ঐ মোচার অগ্রভাগ ঘষিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘষিয়া, তাহার মাথায় চার-পাঁচ হাত উপর হইতে সমানভাবে জলের ধারানী দিতে বলিলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল এইরূপে জল ঢালিবার পরও রোগীর দেহে জীবনের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তখন তিনি একখানি কাপড় বেশ করিয়া পাকাইয়া লইয়া, ঐ কাপড় মৃত ব্যক্তির পৃষ্ঠে জোরে মারিতে লাগিলেন, এদিকে জলও সমভাবে

তাহার মাথায় ঢালা হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত জলের ধারানী দিতে দিতে রোগীর চক্ষুর পাতা অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে গাত্রের লোম সকল খাড়া হইয়া উঠিল। তাহার পর সেই মৃতদেহ সত্যই চক্ষু মেলিল। আমরা দেখিয়া অবাক হইলাম। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত শরীর নড়িয়া উঠিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কম্পন আরম্ভ হইল। জ্বর আসিবার সময় যেরূপ কম্পন হয়। অর্থাৎ দু'তিনটা লেপ গায়ে দিয়া ঠাসিয়া ধরিলেও কম্পন থামে না,—এ সেইরূপ কম্পন। তখন জলের ধারানি বন্ধ করা হইল। ক্রমে

রোগীর চেতনা হইল। গাঢ় নিদ্রার পর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেরূপ ভাব হয়, রোগী তখন সেইভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, 'আমি এখানে কেন?' তাহার সেই কথা শুনিয়া তাহার সঙ্গীগণ কাঁদিয়া উঠিল। যাহা হউক, রোগী ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল।

বেলা তখন প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। আমরা স্নানাহার ভুলিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি! সত্য কি স্বপ্ন দেখিতেছি সে বোধ নাই। ক্রমে রোগী উঠিয়া দাঁড়াইল, আস্তে আস্তে হাঁটিয়া নৌকায় উঠিল এবং নৌকায় বসিয়া পা ঝুলাইয়া পা ধুইতে লাগিল। তাহার পর তাহারা সকলে ত্বরিত বেগে নৌকা বাহিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।"

এই যে 'জলসার' করা হ'ল, এ গরম জল নয়। তবে মাথার উত্তাপ সঞ্চার করবার জন্যেই বোধ হয় মোচার অগ্রভাগ দিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে ঘষে নেওয়া হয়েছিল। আর রোগীর অসাড় দেহে সাড় করবার জন্য বোধহয় কাপড় পাকিয়ে মধ্যে মধ্যে তার পিঠে মারা হচ্ছিল।

নামের মহিমা

যখন শ্রীচক্রবর্তী রাজা (রাজাগোপালাচারী) আমাদের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হলেন, আমার মনে হয়েছিল যে এতদিনে আমি এমন একটি লোকের সন্ধান পেলুম যাঁর নাম তাঁর জীবনযাত্রায় অভিব্যক্ত হয়েছে। কারণ তখন আমাদের জাতীয় সংবিধান (Constitution) গঠিত হয়নি। এবং সেই জন্যে গভর্ণর জেনারেলই ছিলেন আমাদের দেশের রাজা। চক্রবর্তী রাজা আমাদের দেশের রাজ চক্রবর্তী হলেন। তারপরে যখন তাঁর কার্যকাল ফুরিয়ে গেল, তখন এলেন রাজেন্দ্রবাবু। ইনিই এখন আমাদের প্রেসিডেন্ট—অর্থাৎ কিনা রাজ রাজেন্দ্র।

আমাদের দেশের এই দুই প্রধান নেতার জীবনে তাঁদের নামের মহিমা ফুটে উঠেছে। এই সঙ্গে আমাদের বাঙলাদেশের চীফ মিনিষ্টার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্বন্ধে একটি গল্প মনে পড়ছে। একদিন আমার নাতি-নাতনীতে কথা হচ্ছে, আর আমি পাশের ঘর

থেকে শুনছি। নাতনী (বয়স ছয়) তার দাদাকে (বয়স আট) জিজ্ঞেস করছে—"হ্যাঁ দাদা, একটা সভাকে বিধানসভা বলে কেন?" নাতি উত্তর দিচ্ছেন—"তা আর জানিস না, ও সভা ডাক্তার বিধান রায়ের নামে হয়েছে। দেখিস্‌নি আমাদের বারাসাতে বিধান সিনেমা রয়েছে। ইনি আমাদের সব চেয়ে বড় মন্ত্রী জানিস্‌ তো। আর তিনি প্রকাণ্ড বিদ্বান।" নাতনী বলছে—"তাই বুঝি? কিন্তু তা হ'লে ডাক্তার রায়কে মুখ্যমন্ত্রী বলে কেন?" আমি কান খাড়া করলুম নাতি কি জবাব দেয় শোনবার জন্যে। কিন্তু নাতি কোন জবাব দিতে পারলে না। আমি তখন তাদের মুখ্যু ও মুখ্যর তফাত বুঝিয়ে দিলুম।

ডাক্তার রায়ের কথায় মনে পড়ছে শ্রীঅমূল্য উকিলের কথা। নাম শুনে কেউ মনে করবেন না যে, তিনি একজন এড্‌ভোকেট। তিনি হচ্ছেন যক্ষ্মা রোগের বিখ্যাত ডাক্তার।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাম আর কাজ মেলে না। যখন Armstrong সাহেব কলকাতায় পুলিশ কমিশনার হলেন, তখন আমরা মনে ভেবেছিলুম যে, এইবার চোর-ডাকাতের মধ্যে সাড়া পড়ে যাবে। তারা কতটা ভয় পেয়েছিল জানি না; কিন্তু সেই সময় বেধেছিল বিরাট হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। বহু লোক হতাহত হয়েছিল আরমষ্ট্রঙের দৃঢ় বাহু তাদের রক্ষা করতে পারেনি। পুলিশ কিম্বা মিলিটারি অফিসারের নাম কিন্তু এরূপ জাঁদরেল হলে বেশ মানায়। যেমন জেনারেল আয়রণ-সাইড।

একবার এক পুলিশ অফিসারের নাম নিয়ে তামাসা করতে গিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছিলুম। আমি তখন কলেজে পড়ি। আমাদের অফিসের কাছে বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপরে তখন পুলিশের একটি ফাঁড়ী ছিল। সেই ফাঁড়ীর চার্জে ছিলেন একজন ইংরাজ সার্জেন্ট। সে সময়ে আমাদের পাড়ায় কিছু চুরি-চামারী হচ্ছিল। আমি ভাবলুম আমাদের পাড়ায় পুলিশের থানা রয়েছে এবং একজন সাহেব

অফিসার রয়েছে; তবুও চোরেরা ভয় পাচ্ছে না কেন? পরে শুনলুম যে, সেই থানা অফিসারের নাম হচ্ছে সার্জেণ্ট ললেস (Sergeant Lawless)। তখন ভাবলুম, এইতেই চোরেরা সাহস পেলে নাকি? তারা বোধ হয় মনে করেছে যে, তারা আইন ভাঙলেও এ কিছু বলবে না।

কিছুদিন পরে এই অফিসার বদলি হয়ে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন একজন লম্বা মতন সাহেব। একদিন ভাবলুম, যাই গিয়ে সাহেবটাকে পাড়ার চুরির কথা বলে আসি, আর আগের সাহেবটার নাম নিয়ে একটু ঠাট্টা করে আসি।
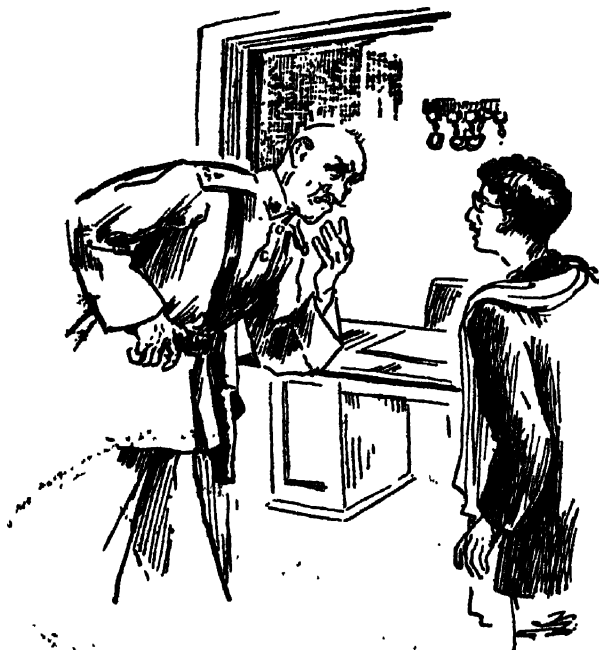
একদিন সকালে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করলুম। এ কথা সে কথার পর বললুম, "সাহেব, আপনি আসাতে আমাদের খুব ভরসা হয়েছে। শুনেছেন ত, এ পাড়ায় কি রকম চুরি হচ্ছে?"

সাহেব বললেন, "আপনাদের ভয় নেই। আমরা চোর ধরবার বন্দোবস্ত করছি।"

আমি বললুম, "আসল কথা হচ্ছে যাতে চুরি না হয় সেই চেষ্টা করা। চোরেরা যদি বোঝে যে চুরি করলে আর রেহাই নেই, তা হ'লে ভয়ে চুরি করবে না।" তারপর হেসে বললুম, "আপনার আগের অফিসারটি কিন্তু চুরির জন্যে কিছুটা দায়ী ছিলেন।"

সাহেব—সে কি রকম?

আমি—রকম আর কি? চোরেরা হয়ত তাঁর নাম শুনে আস্পর্ধা পেয়েছিল। জানেন তো, তাঁর নাম ছিল, সার্জেণ্ট ললেস? হয়তো চোরেরা মনে করেছিল যে, এ আমাদেরই একজন।

আমি মনে করেছিলুম আমার কথায় সাহেব খুব হাসবেন। তা কিন্তু হ'লো না। বরঞ্চ তিনি যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। মুখটা যেন কাঁচু-মাচু। তখন কিন্তু কারণ বুঝতে পারিনি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার নামটা কি?"

সাহেব একটু চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "I am Sergeant Coward."

আমি শুনে অপ্রস্তুতের এক শেষ। পালাতে পথ পাই না।